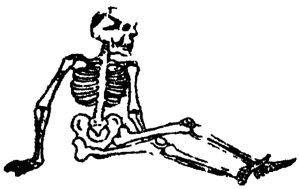
শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্প





বিভিন্ন সাহিত্যিকদের
শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্পের সংকলন

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশ করেছেন :
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

দ্বিতীয় প্রকাশ :
শ্রাবণ, ১৩৬৭

সম্পাদনায় :
শ্রীসুজিত কুমার নাগ

প্রচ্ছদ :
শ্রীশৈলেশ পাল

মুদ্রাকর :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৬

আগন্তুক

হেমেন্দ্রকুমার রায়



আমাদের গ্রামখানি অনেকটা উপদ্বীপের মত। তার পূর্ব ও উত্তর দিক দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম দিকে আর একটি বড় নদীর ভিতর গিয়ে পড়েছে। পৃথিবীর মাটির সঙ্গে আমাদের গ্রামের অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে কেবল দক্ষিণ দিকে।

কিন্তু সে যোগটুকু না থাকলেও আমরা হয়তো দুঃখিত হতুম না। আমাদের গ্রামের উত্তর প্রান্তে নদীর কিনারায় যে শ্মশান আছে এ অঞ্চলে তার চেয়ে বড় শ্মশান আর নেই এবং সেই শ্মশানে শবদাহ করবার জন্যে দূর গ্রাম থেকেও লোক আসে ঐ দক্ষিণ দিক দিয়েই। এখানে যে শ্মশানেশ্বর মহাদেব বিরাজ করছেন, তিনি নাকি অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা—যদিও তিনি যে নিদ্রাগত না হয়ে অহরহই জাগ্রত হয়ে আছেন এমন কোন প্রমাণই আমরা পাই নি। কিন্তু অধিকাংশ লোক সেই কথাই বিশ্বাস করে, অতএব দেবতার মহিমায় এখানকার শ্মশানটি পরিণত হয়েছে মহাশ্মশানে। শবযাত্রীদের অস্বাভাবিক ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠ থেকে ঘন ঘন হরিবোল ধ্বনি উঠে আমাদের গ্রামের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে তোলে যখন-তখন। দিনের বেলায় সেই সোরগোল কোন রকমে সহ্য করা যায়, কিন্তু নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে সে চীৎকার অমানুষিক হয়ে চতুর্দিকে সৃষ্টি করে কেমন একটা অসহনীয় অপার্থিব ভাব। ঘুমন্ত শিশুরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে জেগে কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। গ্রামখানি পুরোপুরি দ্বীপ হ'লে এ-সব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হ'ত না।

পল্লীগ্রামের মহাশ্মশানের ভয়াবহ বীভৎসতা কলকাতার বাসিন্দারা ধারণায়ও আনতে পারবেন না। কলকাতার শ্মশানগুলোকে তো বাহির থেকে দেখায় সৌখিন মানুষদের বসতবাড়ীর মত। তাদের ভিতরটাও জীবন্ত জনতার আনাগোনায় ও কণ্ঠস্বরে সর্বদাই শব্দিত হয়ে থাকে, এমন কি সেখানে অমাবস্যা রাত্রির অন্ধতাও ঘুচিয়ে দেয় বহু ইলেকট্রিকের বাতি।

কিন্তু পল্লীগ্রামের মহাশ্মশান, বড় ভয়াবহ ঠাঁই। নিঝুম রাতে সেখানে পদার্পণ করলে সর্বাঙ্গে জাগ্রত হবে বিভীষিকার রোমাঞ্চ! হলুদবরণ চাঁদের পাণ্ডু আলো চারিদিকে প্রকাশ করে অস্পষ্টতার রহস্য এবং তারই সঙ্গে দুটো-একটা হ্যারিকেন-লণ্ঠন টিম টিম্ ক'রে জ্বলেও স্পষ্ট করে দেখাতে পারে না কোন কিছুই। বাতাসে বাতাসে জেগে ওঠে যেন মরন্ত রোগীর নাভিশ্বাস এবং তাই শুনে চতুর্দিক থেকে কালো কালো দানবের মত মস্ত মস্ত গাছপালাগুলো শিউরে শিউরে কেঁদে কেঁদে ওঠে সভয়ে এবং সশব্দে! এখানে-ওখানে ছাড়া ছাড়া হয়ে অপচ্ছায়ার মত নড়াচড়া করে যে-সব জ্যান্ত মানুষ, তাদের সংখ্যা এক হাতের আঙলেই গুণে ফেলা যায়। একটা কি দুটো কিংবা বড় জোর তিনটে চিতা দূরে লক্লক্ ক'রে ওঠে ক্রুদ্ধ নরকনাগিনীর জ্বলন্ত রক্ত-জিহ্বার মত। কোন বৃক্ষেব অদৃশ্য শাখায় বসে অশুভ কণ্ঠে আচমকা চ্যাঁ-চ্যাঁ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে একাধিক প্যাঁচা! চম্‌কে দেয় জীবন্তদের অন্তরাত্মাকে। স্থানে স্থানে রাশিকৃত ভাঙা কলসী ও মাংসহীন অস্থি প্রভৃতির সঙ্গে পড়ে থাকে কোন অগ্নিদগ্ধ মানুষের ভয়াল দেহাবশেষ—কারণ এখানে শহরের মত সব সময়ে মৃত দেহকে নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেলা হয় না। দূরে আনাচে-কানাচে যেখানে চোখ যা-কিছু দেখে সব ছায়া-ছায়ার মত, সেখানে হয়তো মানুষের আধ-পোড়া দেহের অংশবিশেষ নিয়ে মারামারি, টানাটানি, ছেঁড়াছিঁড়ি করে শৃগাল-কুকুরের দল, বিশ্রী চীৎকারে বিষাক্ত করে চতুর্দিক! তারও পরে আরও দূরে যেখানে যেতে নারাজ হয় মানুষের দৃষ্টি, মনে সন্দেহ জাগে, সেখানে হয়তো

চলাফেরা করছে এমন মৃত মানুষের জনতা, পার্থিব জগতে ঠাঁই না থাকলেও রাজি নয় যারা পৃথিবীর মাটি ত্যাগ করতে। বন্ধ হয়ে যায় জীবন্তদের পদচালনা, স্তম্ভিত হয়ে যায় চক্ষু, মন এবং দেহ। তারও উপর থেকে থেকে মাথার উপর দিয়ে ডানা ছট্‌পট করতে করতে উড়ে যায় নিশীথিনীর বৃহত্তর কালো প্রজাপতির মত অমঙ্গলকর ও নির্বাক বাদুড়ের দল। অভিধান শ্মশানের আর এক নাম দিয়েছে—'প্রেতভূমি'। এ নাম মিথ্যা নয়। পল্লীগ্রামের শ্মশান দেখলে প্রেতভূমি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

এমনি এক শ্মশান থেকে প্রায় সিকি-মাইল দূরে আমরা বাস করি। আমাদের বাড়ী হচ্ছে গ্রামের শেষ বাড়ী। তারপর একটা ছোট মাঠ। তারপর একটা ছোট জঙ্গল। তারপরেই নদীর ধারে শ্মশান।

কৃষ্ণপক্ষের কালো রাতের জন্যে আসর ছেড়ে মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা আলো।

সেদিন কি বিষম গুমট! বাতাসের দম যেন একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, নড়ছে না গাছের একটা পাতা পর্যন্ত। ঘরের ভেতরে টেকা দায়। বাড়ীর বাইরের রোয়াকে এসে বসলুম এবং হাত-পা ছড়িয়ে ভালো করে বসতে না বসতেই শুনলুম বহুকণ্ঠের চীৎকার—"বল হরি, হরিবোল! বল হরি, হরিবোল! বল হরি হরিবোল!"

ঝিল্লীমুখর উত্তপ্ত অন্ধকার রাত্রে এই মৃত্যুধ্বনি মনের মধ্যে জাগিয়ে তুললে অশান্তি। একটু তফাতে,আমার বাড়ীর সামনে দিয়েই শ্মশানে যাবার রাস্তা। কিন্তু চারিদিকে এত অন্ধকার যে শবযাত্রীদের কারুকেই দেখতে পেলুম না—কেবল শোনা যেতে লাগল হরিনামের সেই শব্দময় বিভীষিকা! ক্রমে তা ক্ষীণতর হয়ে একেবারে থেমে গেল। বুঝলুম শ্মশানে পৌঁচেছে শবযাত্রীরা।

শবযাত্রীদের কণ্ঠ মৌন হল বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামের রাত্রের কতকগুলি নিজস্ব ধ্বনি আছে। থেকে থেকে গাছের পাতাদের ফিস্‌-ফাস; হঠাৎ জেগে ওঠা পাখীদের ডানা ঝাড়া,গাছের তলায় শুক্‌নো পাতাদের



ভিতরে সড়্-সড়্ শব্দ তুলে হয়তো চলে যায় কোন সাপ বা সরীসৃপ, হয়তো ডেকে ওঠে কর্কশ স্বরে একটা কি দুটো তক্ষক : কিংবা শোনা যায় শৃগাল-সভার স্বল্পস্থায়ী হট্টগোল ; এবং এইসবের উপরেও সর্বক্ষণ জেগে থাকে ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ করে ঝিঁ-ঝিঁ পোকাদের একটানা আর্তনাদ !

বেশ খানিকক্ষণ ধরে একলা বসে শুনলুম সেই রাত্রির ধ্বনি। তারপর চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগল তন্দ্রার আমেজে। উঠি উঠি করছি, হঠাৎ যেন অন্ধকার ফুঁড়েই একেবারে আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল একটা সুদীর্ঘ ছায়ামূর্তি। এমন আচম্বিতে এত নিঃশব্দে তার আবির্ভাব, চমকে না উঠে পারলুম না।

শুধালুম "কে ?"

অন্ধকারে দেখতে পেলুম, মূর্তির চোখদুটো চক্‌চক্ করে উঠল। সে অত্যন্ত গম্ভীর ও শুষ্কস্বরে বললে,—"ক্ষুধার্ত অতিথি।"

—"অতিথি ! এই রাত্রে !"

—"ক্ষুধার্তের সময় অসময় নেই। কেবল ক্ষুধার্ত নই, আমি শীতার্তও। শীতে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। আগে বাড়ীর ভিতরে একটু আশ্রয় দিন—বাইরে আর দাঁড়াতে পারছি না।"

মহাবিস্ময়ে বলে উঠলুম, "বলেন কী মশাই, আপনার শীত করছে ? আর এদিকে দারুণ গুমটে সিদ্ধ হয়ে আমরা যেতে বসেছি।"

সে যেন কাঁপতে কাঁপতে বললে, "বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথায়, তাহলে এই দেখুন ! কই, আপনার হাত কই ?"

আমার একখানা হাত বাড়িয়ে দিলুম। সেও হাত বাড়িয়ে ধরলে আমার একখানা। কিন্তু, পর-মুহূর্তেই আমি শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি নিজের হাতখানা টেনে নিলুম ! উঃ কি অসম্ভব ঠাণ্ডা তার হাত। ঠিক যেন জমাট বরফ দিয়ে গড়া।

সে কাতরস্বরে বললে, "বাড়ীর ভেতর চলুন, বাড়ীর ভিতরে চলুন ! আমি আর বাইরে দাঁড়াতে পারছি না !"

বাড়ীতে ঢুকে ভিতর থেকে সদর দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছি, হঠাৎ আকাশের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চিরে ফালা-ফালা করে দিয়ে দপ্‌দপিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলে উঠল একটি অতি দীর্ঘ বিদ্যুৎ-শিখা! তার পরেই বজ্রের গর্জন! ইতিমধ্যে অন্ধকার কখন যে গোটা আকাশটা ভ'রে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে মেঘের পর মেঘের দল সেটা একেবারেই আমার নজরে আসেনি। বোধহয় বৃষ্টি পড়তে আর দেরি নেই।

বৈঠকখানায় প্রবেশ ক'রে টেবল্ ল্যাম্পটা উস্কে দিলুম। তারপর কৌতূহলী দৃষ্টি ফেললুম সেই ক্ষুধার্ত ও শীতার্ত অতিথির দিকে।

অদ্ভুত, সবই অদ্ভুত! যেমন ঢ্যাঙা, তেমনি রোগা তার দেহ। খালি গা, খালি পা, কোমরে জড়ানো একখানা নতুন কাপড়। দেহের কোথাও যেন মাংস নেই, কেবল চাদর দিয়ে ঢাকা আছে যেন হাড়গুলো। কুচ্‌কুচে কালো রং। মাথায় বড় বড় চুল—বিশৃঙ্খল। মুখের দুই পাশ চুপ্‌সে বসে গিয়েছে। শুকনো ঠোঁট দুখানা ঠেলে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে বাইরে—যেন মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ। আর কী বুভুক্ষু দৃষ্টি!

জানিনা, বুকের কাছটা কেন ছম্-ছম্ করে উঠল! সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বাড়ীর বাইরে ঝড়ের চীৎকার।

থর্-থর্ করে কেঁপে উঠে আগন্তুক বললে, "উঃ। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। জানলা বন্ধ করে দিন। জানলা বন্ধ করে দিন!"

জানালাগুলো বন্ধ ক'রে ফিরে দাড়িয়ে বললুম "মহাশয়ের কি কোন ব্যামো-ট্যামো হয়েছিল?"

"ব্যামো? হ্যাঁ হয়েছিল বৈকি! শক্ত ব্যামো! সুবিধে পেয়ে শত্রুরা আমাকে জমের বাড়িতে পাঠাতে চেয়েছিল। তাই তো আমি তাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

—"শত্রু? শত্রু আবার কারা?"

—"জ্ঞাতিশত্রু, মশাই জ্ঞাতিশত্রু। তাছাড়া আবার যমের বাড়ীতে পাঠাতে চাইবে কে ?"

—"আপনার কথা আমি ভাল করে বুঝতে পারছি না। তারা কি আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল ?"

—"বেশী কথা বলবার শক্তি আমার নেই। শুনছেন না ; ঝড়ের সঙ্গে আবার বৃষ্টি নামল। পৃথিবী এখনি ভাসবে, শীত আরো বাড়বে। আমি শীতার্ত, আমি ক্ষুতার্ত ! উঃ, কি ক্ষিদে পেয়েছে—আমি ক্ষুধার্ত ! কিছু খেতে দিন মশাই, আগে কিছু খেতে দিন।"

বললুম, "এত রাত্রে বাড়ীর সকলেরই খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। তবু চেষ্টা করে দেখছি, একটু অপেক্ষা করুন। কিন্তু বেশী কিছু দিতে পারব বলে মনে হয় না।"

"যা পারেন তাই দিন, যা পারেন তাই দিন ! ওঃ, শত্রুরা না খাইয়ে মারবে বলে কতদিন আমাকে কিছু খেতে দেয় নি—কত দিন আমি উপোস করে আছি !"

বাড়ীর ভিতরে গিয়ে কোনরকমে সংগ্রহ করলুম কিছু ভাত, কিছু তরকারি খানতিনেক রুটি, দুটি সন্দেশ ও চারটি নারিকেল নাড়ু। থালার উপরে তাই সাজিয়ে নিয়ে ফিরে এলুম বৈঠক খানায়।

দেখলুম একদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগন্তুক যেন কান পেতে কি শুনছে। চোখ দেখলে মনে হয়, তার দৃষ্টি যেন ঘরের নিরেট দেওয়াল ভেদ করে চলে গিয়েছে বাইরে, কত দূরে !

বললুম, "আপনার খাবার এনেছি।"

সে যেন আমার কথা শুনতেই পেল না।

আচমকা ফিরে দাঁড়িয়ে ত্রস্তস্বরে সে বলে উঠল, "তারা আসছে, তারা আসছে !"

বিপুল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কারা আসছে ?"

—"আমার শত্রুরা ! আমি তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি,

আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি ! আমি চললুম !"

—"সে কি, আপনার খাবার এনেছি যে ?"

—"না. না, আমি আর খাব না, আর আমি ক্ষুধার্ত নই। শত্রুরা আবার আমাকে যমের বাড়ীতে পাঠাবার জন্যে ছুটে আসছে ! আমি পালাই—আমি পালাই ।" বলতে বলতে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল উদভ্রান্তের মত। তারপরেই দুম্ ক'রে সদর দরজাটা খোলবার শব্দ হল।

হতভম্বের মত খাবারের থালা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, কে এই আশ্চর্য লোকটা ? পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে আসেনি তো ?

সদর দরজার কপাট দুখানা ঝোড়ো হাওয়ায় দুমদাম করে একবার বন্ধ হচ্ছে, একবার খুলে যাচ্ছে। তখন পৃথিবীর আর সব শব্দ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ঝড়-বৃষ্টির দাপটে।

দরজাটা আবার বন্ধ করে দেবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছি, আচম্বিতে দেখি ছয়-সাতজন লোক সবেগে দৌড়ে এসে হুড়মুড় ক'রে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল।

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা তুলে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কে ?"

তাদের একজন বললে, "আমরা শ্মশান থেকে পালিয়ে আসছি।"

—"পালিয়ে আসছেন ? কেন ?"

—"এমন দুর্যোগে শ্মশানে কোন মানুষ তিষ্ঠোতে পারে ? ছুটতে ছুটতে এই পর্যন্ত এসে আপনার বাড়ীর আলো দেখে এইখানেই ঢুকে পড়েছি।"

—"তাহলে আপনাদের শবদাহ শেষ হয়েছে ?"

—"না মশাই, না। আমাদের কপাল আজ বড়ই মন্দ। শব শ্মশানে রেখে পাশের জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলুম। কিন্তু ফিরে এসে দেখি, খাটের উপর থেকে মড়া অদৃশ্য হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার মশাই, আজব কাণ্ড !"

ডাক্তারের বিপদ



বনফুল

অনেকদিন আগের কথা। সন্ধ্যে বেলায় পাশের গ্রাম থেকে ডাক এলো। না গেলেই নয়। রোগীর অবস্থা শুনে ডাক্তারবাবু না বলতে পারলেন না। এসেছিলেন এক ভদ্রলোক। ডাক্তারবাবু ভাবলেন যাই। আর তাছাড়া সেবাই তো তার ধর্ম। অগত্যা ডাক্তারবাবুকে যেতে হল। দূর অবশ্য বেশী নয়, দুটি গ্রামের মধ্যে মাইল চারেকের একটা বিলের ব্যবধান। এই বিলটা সম্বন্ধে চারপাশের লোকের অনেককালের ভয় আছে। বিশেষ করে বিলের মাঝামাঝি জায়গায় যে বহুকালের বুড়ো বটগাছটা আছে, সেখানে যে অসংখ্য ভূতের বাস, তাতে আর কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু রোগীর বাড়ির লোক যখন ভরসা দিলে যে, তারা নিজে তাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে, তখন আর ভয় করবার কি আছে? তিনবার দুর্গানাম স্মরণ করে হংসেশ্বর ডাক্তার ভর সন্ধ্যেবেলাতেই বেরিয়ে পড়লেন।

রোগী দেখে, ওষুধের ব্যবস্থা করে যখন ফিরলেন, তখন রাত দশটার বেশী নয়। ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। তার ওপর সঙ্গে আলো নিয়ে আসছে দু'জন বিখ্যাত লাঠিয়াল। ডাক্তারবাবু নির্ভয়ে খোস-গল্প করতে-করতে চলে আসছেন—বরং বেশ ভালই লাগছিল। যে বটগাছটার সম্বন্ধে সকলেরই ভয়, তারই নীচে দিয়ে আসতে ভয়ে তাঁর গা ছম্-ছম্ করলেও কেমন একটু গর্ব বোধ করছিলেন।

এমনি করে আসতে আসতে যখন প্রায় গ্রামের সীমানায় এসে পৌঁছেছেন, আর মাত্র মাইল-খানেক বাকি, হঠাৎ একটা মস্তবড়

ঘোড়া ছুটতে-ছুটতে এসে প্রায় তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লো। এত রাত্রে হঠাৎ একটা ঘোড়া দেখে এঁরা তিনজনেই চমকে উঠলেন।

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে সঙ্গের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন,—কার ঘোড়া হে? চমৎকার ঘোড়াটি তো!

একজন ঘোড়াটিকে ভালো করে দেখে বললে,—সম্ভব মদননগরের বাবুদের। তাঁরা একটা নতুন ঘোড়া কিনেছেন শুনেছি। বোধহয় সেইটে।

আর একজন বললে জিন-লাগাম পরানো। হয়তো রাস্তায় কোথাও সওয়ার ফেলে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবুর ঘোড়ার খুব সখ। তিনি ঘোড়াটার গায়ে আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে বললেন,—কিন্তু দুষ্টু ঘোড়া বলে তো বোধ হচ্ছে না।

একে ঘোড়ার সখ, তার উপর সমস্ত দিন হেঁটে-হেঁটে তাঁর পায়ের আর কিছু ছিল না। ঘোড়াটি দেখেই লোভ হচ্ছিল। এটায় চড়ে যেতে পারলে আর এই মাইল-খানেক হাঁটার দুর্ভোগ ভুগতে হয় না।

একজন সঙ্গী তাঁর মনের ভাব বুঝে বললে,—যাবেন নাকি এটাতে চড়ে? কাল সকালে খোঁজ করতে এলে ফিরিয়ে দিলেই চলবে।

ডাক্তারবাবু মনে-মনে লোভে উসখুস করলেও প্রকাশ্যে একটু ইতস্ততঃ করে বললেন,—সে কি হয়? কার-না-কার ঘোড়া। হয়তো বলবে—

চোখ পাকিয়ে লাঠিয়াল সঙ্গী বললে,—বললেই হলো! আমরা কি চুরি করেছি নাকি? যান তো চলে, যা হয় সে আমরা বুঝব।

বলে ছাতি ফুলিয়ে দুটো ঘুষি মারলে। আসল কথা—এতে তাদেরও স্বার্থ ছিল। এইখান থেকে ডাক্তারবাবুকে ঘোড়ায় উঠিয়ে দিয়ে বিদায় করতে পারলে আর তাদের গ্রাম পর্যন্ত যেতে-আসতে হয় না।

ডাক্তারের নিজের তাগিদও কম নয়। সকাল-সকাল বাড়ি ফেরা নিতান্ত প্রয়োজন। দু'জন বিখ্যাত লাঠিয়ালের ভরসা পেয়ে তিনি আর দ্বিধা করলেন না। টপ করে ঘোড়ায় উঠে বসলেন। ঘোড়া আস্তে আস্তে গ্রামের দিকে চলতে লাগল ; তা দেখে লাঠিয়াল দু'জন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজেদের গ্রামের দিকে ফিরে চলল।

ডাক্তারবাবু এককালে বেশ ভালো ঘোড়সওয়ার ছিলেন। এখনও ঘোড়া দেখলে তাঁর পা সুড়্ সুড়্ করে। অনেক দিন পর ঘোড়া পেয়ে তাঁর ইচ্ছে হলো, একটা ভালো ছাতক দেন। হাতে চাবুক ছিল না,ছিল একটা ভাঙা ছাতা। সেইটা দিয়ে আঘাত করতেই ঘোড়াটা তীরের মত ছুটলো ! বহু ঘোড়ায় এককালে তিনি চড়েছেন, অনেক বদখেয়ালী তেজী ঘোড়া সায়েস্তা করেছেন। কিন্তু কোন ঘোড়া যে এত জোরে ছুটতে পারে, এ তাঁর ধারণাই ছিল না। থামাবার জন্যে তিনি বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই থামানো যায় না। ঘোড়া তীরের মত হাওয়া কেটে ছোটে ! মনে হলো, মাটিতে যেন তার পা ঠেকছে না। এক-একখানা গ্রাম চক্ষের নিমেষে পাশ কেটে চলে যাচ্ছে।

বিলের রাস্তা—অর্থাৎ রাস্তা বলে কিছু নেই। কেবল বাবলার বন। তারই মধ্য দিয়ে ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে কোন দিকে যে ছুটছে, ডাক্তারবাবু কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। কেবল বাবলার বনের মধ্য দিয়ে ছুটতে দেখে মাথা নিচু করে ঘোড়ার গলাটা জড়িয়ে ধরলেন ! হঠাৎ একটু ভরসা হলো কিছুদূর আগে নদী দেখে। তিনি অনুমান করলেন, রূপসী নদী। কারণ এদিকে আর বড় নদী নেই। চাঁদের আলোতে নদীর জল চকচক করছিল। তা দেখে ভরসা হলো এইবার ঘোড়াকে থামতে হবে। রূপসী প্রকাণ্ড বড় নদী। জলও যথেষ্ট। কিন্তু এটুকু ভাবতে তার যতখানি সময় লাগল, ততক্ষণে ঘোড়া নদীর ওপারে পৌঁচেছে ! এতক্ষণ পর্যন্ত ডাক্তারবাবুর জ্ঞান ছিল। কিন্তু ঘোড়া লাফিয়ে নদী পার হলো কি করে, বুঝতে

পারলেন না। ভয়ে তাঁর সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেল। তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

এমনি করে কতক্ষণ চলেছিলেন জানেন না। হঠাৎ এক সময় দেখলেন, প্রকাণ্ড বড় এক রাজবাড়ির দেউড়ির ভেতর দিয়ে এসে একজন ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরলে এবং আর একজন তাঁকে পরম সমাদরে, নামতে ইঙ্গিত করলে। ডাক্তারবাবুর তখন জ্ঞান ছিল বলা চলে, ছিলনাও বলা চলে। তিনি চোখ মেলে সব দেখছিলেন এবং কান দিয়ে সব শুনছিলেন, কিন্তু কিছুই পরিষ্কার করে বুঝতে পারছিলেন না। চাকরের ইঙ্গিতমত তিনি তার পিছু পিছু হলঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। সঙ্গেসঙ্গে আর একজন চাকর পা ধোয়ার জল, গামছা নিয়ে এল। ডাক্তারবাবু হাতমুখ ধুয়ে অনেকটা সুস্থ হলেন। তারপরে হলঘরে গিয়ে বসলেন।

মস্ত বড় হল। নীচে ঘরজোড়া ফরাস পাতা। অনেকগুলো তাকিয়া এখানে-ওখানে ছড়ানো। ওপরে ঝাড়ের আলোয় সমস্ত ঘর যেন ঝলমল করছে। আর সেই ঘরের মধ্যখানে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে নীরবে আলবোলা টানছেন। তাঁর মাথায় প্রকাণ্ড বড় টাক ঝাড়ের আলোয় চকচক করছে। পাকা আমের মত টুকটুকে রঙ। গায়ে একটা ফিন ফিনে হাতকাটা বেনিয়ান—বাঁ-হাতে সোনার তাগাটা দেখা যাচ্ছে। পরনে দামী একখানি ধুতি। কেমন যেন বিমর্ষভাবে বসে আছেন। তিনি ডাক্তারবাবুর দিকে একবার তাকিয়েই নীরবে ঘাড় নেড়ে বসতে বললেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলেন। মরা ছাগলের মত এমন ঘোলাটে চোখ মানুষের দেখা যায় না। সে দৃষ্টিতে তাঁর হাড়ের ভিতর পর্যন্ত বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

ঘর নিস্তব্ধ।

কেবল দেওয়ালের বড় ঘড়িটা টিক্-টিক্ করছিল। ডাক্তারবাবু চেয়ে দেখলেন, রাত্রি মোটে বারোটা পাঁচ।

ভয় করবার কিছু নেই। এতক্ষণ মাঠে-মাঠে ঘুরছিলেন, এখন বরং লোকালয়ে ভদ্রলোকের আশ্রয়ে এসে পৌঁছলেন। তবু কেমন একটা অজানা ভয়ে তাঁর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল! এক গ্লাস জলের জন্য কাকে বলা যায় ভেবে এদিক-ওদিক চাইতেই একটা চাকর এসে রূপার গ্লাসে এক গ্লাস শরবত এনে তাঁর সম্মুখে নামিয়ে দিলে। ডাক্তারবাবু খুশী হয়ে তার দিকে চাইতেই তার চোখে চোখ পড়ে গেল। ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। তাঁর হাত কেঁপে উঠল। আশ্চর্য! এরও চোখ তেমনি ঘোলাটে।

কিন্তু তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। তিনি ঢক-ঢক করে এক নিঃশ্বাসে শরবতটা পান করে ফেললেন। আঃ! এমন চমৎকার শরবত তিনি কখনও খাননি। শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। তখনই আর একজন পান-তামাক নিয়ে এল। ডাক্তারবাবু তার চোখটা কি-রকম দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লোকটা যেন তাঁর মনের মতলব বুঝতে পেরে ফিক করে একটু হেসে চোখ নামিয়ে সরে গেল। ডাক্তারবাবু আর কিছু না বলে একটা পান মুখে দিয়ে তামাক টানতে লাগলেন। কোথাকার তামাক এটা? চমৎকার তামাক। খেতে-খেতে সুখে চোখ বুজে আসে।

সেই বুড়ো ভদ্রলোক তখনও একমনে তামাক টেনেই চলেছিলেন। কিন্তু একটা কথাও বলছিলেন না। বাইরে বহু লোকজন যাওয়া-আসা করছিল। কিন্তু তাদের কারও মুখে হাসিও নেই, কথাও নেই। আরও একটা আশ্চর্যের বিষয়, ডাক্তারবাবু যারই দিকে চেয়ে দেখেন সবাই চোখ নামিয়ে চলেছে। এতগুলো লোক যে এ বাড়িতে রয়েছে তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। কথা তো কেউ বলছেই না, এমন কি, তাদের পায়ের শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবুর মনে হলো, এ বাড়িতে হয়তো কারও কঠিন অসুখ করেছে। হয়তো

অথন-তখন অবস্থা। ব্যাপার দেখে কর্তা বাইরে এসে গালে হাত দিয়ে বসেছেন। লোকজনের মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না।

কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না এ বাড়িটা কাদের হতে পারে। এঁরা যে রাজাবিশেষ লোক, তাতে সন্দেহ নেই। এদিকের বিশ-পঁচিশ মাইলের ভেতর প্রত্যেক গ্রাম কখনো-না-কখনো কোন-না কোন উপলক্ষে তিনি দেখেছেন। ঘোড়া তাঁকে দু-ঘণ্টার মধ্যে এখানে এনে ফেলেছে। যত জোরেই ছুটুক, দু'-ঘণ্টায় আর কতই বা রাস্তা যাওয়া যায়? বহু চেষ্টা করেও এ-বাড়ি ডাক্তারবাবু আর কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। ব্যাপারটা বুড়ো ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করবেন মনে করছেন, এমন সময় খাবার ডাক এল! ডাক্তারবাবু খেতে গেলেন।

খাবারের আয়োজন দেখে ডাক্তারের চক্ষুস্থির। প্রকাণ্ড এক সোনার খালায় খান-কয়েক ফুলকো লুচি। তার চারিদিকে কত যে তরকারি থরে থরে সাজান, গরীব ডাক্তারবাবু কখনো তা চক্ষেও দেখেননি। রাত হয়েছে, অতিরিক্ত পথশ্রমে ক্ষুধাও কম লাগেনি। তিনি আর কালবিলম্ব না করে বসে পড়লেন।

খেতে বসেই মনে হলো, সবই আছে বটে, কেবল এক টুকরা লেবু আর নুন নেই। কথাটা তাঁর মনে উদয় হওয়ামাত্র ঠাকুর এসে একটা রেকাবিতে করে নুন আর লেবু রেখে গেল। সব রান্নাই চমৎকার হয়েছিল, বিশেষ করে তপসে মাছ ভাজা বড় ভালো লাগলো। এদিকে তপসে মাছ পাওয়া যায় না। ভদ্রলোক কি করে কোথা থেকে যোগাড় করলে কে জানে।

ডাক্তারবাবুর মনে মনে হাসি পেল যে, ভদ্রলোক এত কষ্ট করে দুষ্প্রাপ্য তপসে মাছ যোগাড় করেছেন আর গলদা চিংড়ি যোগাড় করতে পারেন নি! চিন্তা করা মাত্র গলদা চিংড়ির মালাইকারি এল। ডাক্তারবাবু কিন্তু এ কথা ভেবে দেখলেন না যে, তিনি মনে মনে চিন্তা করামাত্র কি করে এক একটা জিনিস এসে উপস্থিত হচ্ছে। ভাববেন

বোধ হয় দিতে ভুলে গিয়েছিল, এখন এনে দিচ্ছে। ফলের থালাটা কোলের কাছে টেনে এনে দেখলেন, ফলের আর বাকি কিছু নেই, এক আম ছাড়া।

তা এবারে এদিকে আম মোটেই হয়নি। গোড়ায় মুকুল ভালোই হয়েছিল। কিন্তু ফাল্গুনের গোড়ায় ক'দিন কী যে কাল-বৃষ্টি হলো, একটি মুকুলও রইল না—সব ঝরে গেল। আম নেই সেইজন্যেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে মালদহের ভালো ফজলী আম যখন তাঁর সামনে এল, তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। অবাক হয়ে ঠাকুরের মুখের দিকে চাইতেই—সেই চোখ! মরা-ছাগলের মত ঘোলাটে। ঠাকুর সঙ্গে-সঙ্গে যেন অপ্রস্তুত হয়ে হেসে হেসে চোখ নামিয়ে চলে গেল বটে, কিন্তু সেই এক মুহূর্তের দৃষ্টিই তাঁর হাড়ের ভেতর পর্যন্ত ঠক-ঠক করে কাঁপিয়ে দিলে।

ডাক্তারবাবু পরম পরিতোষ-সহকারে আহার করেও কেমন যেন তৃপ্তি পেলেন না। তাঁর মন তখন বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। কি যে করবেন ঠিক করে উঠতে পারছেন না। কস্তুরী-সুবাসিত পান মুখে দিয়ে সুগন্ধি তামাক টানতে-টানতে একবার মনে হলো পালিয়ে যান। এই থমথমে বাড়ি, বিশেষ ওই বুড়ো ভদ্রলোকটিকে তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। ভদ্রলোক এখনও ঠিক সেই জায়গায় ঠিক তেমন করে বসে। মুখে গড়গড়ার নল। মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবুর মনে হচ্ছিল ভদ্রলোকের মাথাটা আসল নয়—শ্বেত-পাথরের কিংবা অমনি কোনো-কিছুর। কেবল থেকে-থেকে ধূমপান করে প্রমাণ করেছিলেন, না, মাথাটা নকল নয়—আসলই। কিন্তু ভদ্রলোক চোখ তুলে তাকান না কেন? কথাই বা বলেন না কেন? এ কি রকম ভদ্রতা?

এমন সময় ভিতর থেকে ডাক্তারবাবুর ডাক এল রোগী দেখবার জন্যে। রোগীর নামে ভদ্রলোক চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তাই বটে, বাড়িতে কঠিন রোগী না থাকলে লোকে এমন বিমর্ষ হয়ে চুপচাপ

থাকে না। ডাক্তারবাবু উৎসাহের সঙ্গে ভিতরে গেলেন। কত ঘর, কত বারান্দা যে পার হলেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। এত বড় বাড়ি রাজরাজাদের ছাড়া কারও হয় না। কিন্তু কোথাকার রাজা এঁরা? তিনি কি এঁদের নামও শোনেন নি? কি জানি, এ কোন্ দেশ!

অবশেষে রোগীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রকাণ্ড বড় হল-ঘরের এক প্রান্তে একখানা মেহগিনী খাটের উপর রোগী আপাদমস্তক একখানা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে। তার মাথার একরাশ চুল খাট থেকে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। শিয়রে একটি মোমবাতি মিট-মিট করে জ্বলছিল। সে-আলোয় এত বড় হলঘরের কিছুই আলো হচ্ছিল না, কেমন অদ্ভুত ধরনের ঝাপসা দেখাচ্ছিল। খোলা জানালা দিয়ে ঘরের স্থানে স্থানে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, সেই বুড়ো ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই কি করে তাঁর আগেই এসে ঘরের মাঝখানে বসে আছেন। এ ঘরেও মেঝেতে জাজিন পাতা। আর ভদ্রলোক নীচের ঘরের মত অবিকল তেমনি করে বসে—চোখ নামানো, মুখে সেই গড়গড়ার নল, নিঃশব্দে বসে।

কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ ডাক্তারও রোগীর সামনে চটপটে হয়ে পড়েন।

ডাক্তারবাবু একবার ঘরের চারিদিক তাকিয়ে যেন কোন-কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করে রোগীর পাশের খালি চেয়ারটায় বসলেন। কারো দিকে না চেয়েই যেন দেওয়ালকে লক্ষ্য করে বললেন,—কতদিন থেকে অসুখ হয়েছে? অসুখটা কী?

কেউ জবাব দিলে না।

ডাক্তারবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন,—কই, দেখি মা, আপনার হাতটা।

এতক্ষণে যেন রোগীর দেহে স্পন্দন দেখা গেল। কিন্তু মুখের ঢাকা খুললে না, বোধ হয় স্ত্রীলোক বলে।

ডাক্তারবাবু আরও এগিয়ে এসে আর-একবার বললেন,—দেখি হাতখানা।

বলে, হাত বাড়াতেই আর-একখানা হাত চাদরের ভিতর থেকে বেরিয়ে ধীরে-ধীরে তাঁর হাতে এসে ঠেকল—মাংসহীন হাত, আস্ত একখানা হাড়!

ডাক্তারবাবুর সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভয়ে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাতি গেল নিবে। হা-হা করে চারিদিক থেকে একটা বিকট আওয়াজ উঠল। মনে হলো, সে শব্দে সমস্ত বাড়িটা বোধ হয় হুড়মুড় করে তাঁর মাথায় ভেঙে পড়বে। আর চোখ বন্ধ করেও তিনি দেখতে পেলেন, হাজার জোড়া ঘোলাটে চোখ চারিদিকে হাওয়ায় নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে, আর মিটি-মিটি হেসে ইশারা করে তাঁকে যেন ডাকছে।

ডাক্তারবাবু অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে সশব্দে মেঝেয় পড়ে গেলেন।

যখন তার জ্ঞান হলো,তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। দেখলেন বাড়িটা বড় বটে, কিন্তু রাত্রে যে ঐশ্বর্য দেখেছেন, তার কিছুই নেই। দেওয়ালের চুন-বালি খসে-খসে পড়েছে। ঘুলঘুলিতে হাজার হাজার চামচিকে বাসা বেঁধেছে। আর ঘরের মধ্যে ভীষণ একটা দুর্গন্ধ উঠছে। মেঝেতে কাল যে জাজিম দেখেছেন, তার চিহ্নমাত্র নেই। সে লোকজনও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। ঘরের এক প্রান্তে একটা খাট আছে বটে—কিন্তু মেহগিনীর নয়, একটা সাধারণ পায়া-ভাঙা তক্তপোশ। ওর ওপরে যে ছেঁড়া তোষকটা আছে, তাব থেকে ইঁদুরে তুলো বের করে ঘরময় ছড়িয়েছে। ডাক্তারবাবু প্রায় হামাগুঁড়ি দিয়ে বাইরে এসে বসলেন। চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার ফলেই হোক অথবা বহুদিন পরে ঘোড়ায় চড়ার জন্যেই হোক, সর্বাঙ্গে ব্যথা বোধ হচ্ছিল। চারিদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলেন,যদি কারও দেখা পাওয়া যায়। এমন সময় দেখা গেল, একটি আধবুড়ো লোক আপন মনে হন

হন করে আসতে-আসতে হঠাৎ তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এইবার ছুট দেবে বোধ হয়।

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি ডাকলেন,—শুনুন, মশাই শুনছেন? এটা কোন্ জায়গা বলতে পারেন?

মানুষের গলা শুনে লোকটি যেন আশ্বস্ত হলো। তবু দূর থেকেই বললে,—মহেশপুর—মালদা জেলা।

—বলেন কি! সে যে অনেক দূর!

—তা বোম্বাই থেকে অনেক দূর বৈকি। এখান থেকে কাছেই।

লোকটি এতক্ষণে কাছে সরে এল। হেসে বললে,—কোত্থেকে আসছেন? ডাক্তার বুঝি?

—হ্যাঁ, ডাক্তার। আসছি মুর্শিদাবাদ থেকে। জঙ্গীপুরের কাছে আমার বাড়ি।

—বুঝেছি।

—কি বুঝলেন বলুন তো? এইখানে বসুন।

লোকটি তাঁর কাছে বসে বললে,—এই যে বাড়ি দেখছেন, এঁরা এককালে রাজা ছিলেন। ইদানীং অবস্থা খারাপ হয়ে আসছিল। কিছুদিন আগে গ্রামে হঠাৎ কলেরা লাগে। কলেরা জোর লাগতেই এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার একদিন রাত্রে প্রাণের ভয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সরে পড়েন। ঠিক সেই রাত্রেই রাজবাড়িতে কর্তাবাবুর একমাত্র মেয়ের কলেরা হলো। গ্রামে ডাক্তার নেই। চারিদিকে ঘোড়া নিয়ে লোক ছুটলো যেখান থেকে হোক ডাক্তার আনতে। কিন্তু ডাক্তার আর পাওয়া গেল না। কর্তাবাবুর বড় পেয়ারের ঘোড়া মশাই—অমন ঘোড়া আমার চোখে আজ পর্যন্ত পড়েনি—মাঝে থেকে সেটারও যে কি হলো, রাস্তাতেই মারা গেল। আর ভোর হতে-না হতে রাজ-বাড়ির সমস্ত লোকও শেষ হয়ে গেল। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার মশাই, যেন ভোজবাজি।

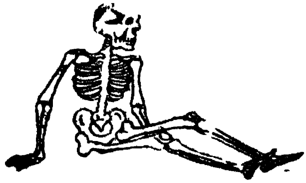
কর্তাবাবুর কথা উঠতেই ডাক্তার শিউরে উঠলেন। বললেন,—তারপর ?

তারপর আর কি মশাই। মাঠে কোন ডাক্তারকে রাত্রে একা পেলে তাঁর আর রক্ষা নেই। আপনি একা নন এর আগে দুই-তিন জনে ডাক্তার এমনি বিপদে পড়েছিলেন। উঠতে উঠতে লোকটি বললো একশো মাইলের ফেরে পড়েছেন। এ বেলা আমার ওখানে খাওয়া-দাওয়া করবেন চলুন, ও বেলা অন্য ব্যবস্থা করা হবে।

ডাক্তারবাবু উঠতে উঠতে বললেন তাই চলুন।

কার সংকেত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত



ছোট, পাড়াগেঁয়ে শহর। ঢালামাঠ, অনেকটা দূরে দূরে কয়েকখানা টিনের ঘর। ঘরগুলো ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আঁকাবাঁকা, কাঁচা মাটির রাস্তা। বিকেল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। পথে লোকজন নেই, একটা গরুর গাড়িও চলছে না। সবে সন্ধ্যে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন মাঝ রাত।

পৃথিবী যেন ভয়ে চোখ বুজে আছে, এমনি অন্ধকার। চলেছে একটানা ধারাবাহিক বৃষ্টি—শূন্যময় শোনাচ্ছে একটা কাতর গোঙানির মত; তাতে শরীরে ঘুম না এসে একটা ক্লান্তিকর বিভীষিকা। বৃষ্টির একঘেয়ে কাতরতা ছাড়া কোথাও এতটুকু শব্দ নেই—না বইছে জোলো হাওয়া, না ডাকছে একটা ঝিঁ-ঝিঁ। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকালে বোধ হয় অন্ধকারকে এমন ভয়ঙ্কর লাগত না। একটা বাজ ডাকলে যেন কেউ কোথাও আছে বলে একটা আশ্রয় পাওয়া যেত। সব-কিছুকে এমন একা, এমন দূর মনে হচ্ছে।

মাঠের শেষে সীমানাতেই কেশব মজুমদারের বাড়ি। তেজারতি কারবার করে কেশবের বিস্তর পয়সা। কিন্তু হলে কী হবে, মনে তার সুখ নেই। তার মুখের চেহারা আজকের এই আকাশের চেয়েও ঘোরালো। তার সমস্ত বাড়িতে আজকের এই বিবর্ণ অন্ধকার যেন নিশ্বাস বন্ধ করে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক-দিন থেকেই এ-অঞ্চলটায় ডাকাতি হচ্ছিল। উড়ো খবর এসেছে, কেশবের বাড়িতেও শিগ্‌গিরই ডাকাতদের পদধূলি পড়বে। কেশব দিনে

রাতে তটস্থ, যেন শুয়ে আছে সে কাঁটার বিছানায়। লাঠি-সোঁটা হাতিয়ার বন্দুক সব সে হাতের কাছে যোগাড় করে রেখেছে বটে, কিন্তু মনে তার তবু স্বস্তি নেই। চোখে একটু ঘুম জড়িয়ে এলে মনে হয় গায়ে তার কে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, চোখ খাড়া রেখে জেগে থাকলে মনে হয় পেছনের দেওয়ালে কার যেন এই ছায়া পড়ল। তারপর আজ যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছে এই যেন কারা এল, এই যেন শোনা গেল কাদের চাপা গলার ফিস্‌ফিসানি।

বৃষ্টির আর বিরাম নেই। জলে-কাদায় রাত উঠেছে ঘোলা হয়ে।

কেশবের স্ত্রী এল তাকে অভয় দিতে ; বললে, 'এবার শুয়ে পড়। ডাকাতদের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, এই ঝড়জলের মধ্যে তারা বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরুবে!'

কেশব বললে, 'হ্যাঁ, এইবার শুয়ে পড়তে হয় বৈকি! কিন্তু বাইরে কে দরজাটায় ধাক্কা দিচ্ছে না?'

কেশবের স্ত্রী খেঁকিয়ে উঠল ; 'দরজায় তো নয়, তোমার মাথায় ধাক্কা দিচ্ছে।'

'না, না, শোন কান পেতে! কে ডাকছে না আমাকে?'

'ডাকাতরা তোমার নাম ধরে আদর করে ডাকতে যাবে না?'

কেশব চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল। ভীত, অসহিষ্ণু গলায় বললে—'আওয়াজটা আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আশ্চর্য, তুমি শুনতে পাচ্ছ না?'

স্ত্রী ধারালো গলায় তাকে ধমকে উঠল : 'কী বুদ্ধি তোমার! ডাকাতরা তোমাকে দরজা খুলে দেবার জন্যে সকাতরে অমন সাধবে কিনা! তারা হুড়মুড় করে খিল-কপাট ভেঙে চলে আসতে-পারে না? হাওয়া, ওটা হাওয়ার শব্দ।'

'না, না, স্পষ্ট মানুষের গলা!' লণ্ঠনটা উসকে দিয়ে কেশব বন্দুকটা বাগিয়ে ধরল। বলল, 'কে?

কোন সাড়া নেই।

স্ত্রী হেসে উঠল : 'ডাকাতরা তাদের নাম-ধাম তোমাকে বলবে কিনা! কী বুদ্ধি!'

কেশব আবার হাঁক দিল—কে ?

দরজার ওপার থেকে ভিজে, মসৃণ গলায় কে বলল, 'আমি!'

ভয়ে সমস্ত ঘরটা যেন ছোট হয়ে এল। লণ্ঠনের আলো যেন গেল কমে, দেয়ালগুলো হেঁটে কেশবের চারপাশে এল সরে, দাঁড়াল ঘন হয়ে। প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করে কেশব বললে, 'কে—আমি কে ?'

'আমি মণীন্দ্র।'



'মণীন্দ্র! কোন মণীন্দ্র ?' কেশবের গলা চিরে আওয়াজ বেরুল। ওপার থেকে রাত্রির অন্ধকার যেন কথা কয়ে উঠল—'মণীন্দ্র, মণি—আপনার ভাইপো। ব্যাণ্ডেলে যে কাজ করত, যাকে আপনি ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন। দরজাটা খুলুন, বাইরে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়!'

'কে, মণি ? কত দিন পরে—'

উৎসাহিত হয়ে কেশব দরজা খুলতে যাচ্ছিল, স্ত্রী তাকে বাধা দিল। গলা নামিয়ে বললে, 'কে না কে মণির নাম ভাঁড়িয়ে এসেছে। খবরদার দরজা খুলো না বলছি, নইলে তিন-চার বছর যে এদিক মাড়ায়নি, সে বলা-কওয়া নেই হঠাৎ এসে দরজায় ঘা মারবে ? তা আবার এ দুর্যোগের রাতে ! কী বুদ্ধি তোমার !'

পাশের জানালাটায় ছিটকিনি লাগানো ছিল না, মণি হঠাৎ ভিতর দিয়ে তার একখানি হাত বাড়িয়ে দিলে। রোগা লিকলিকে, সরু একখানি হাত। বললে, 'আলোটা নিয়ে আসুন, দেখুন, সেই যে ছেলেবেলায় কব্জির কাছটায় কেটে গিয়েছিল সেই দাগটা স্পষ্ট, অটুট আছে। খুলে দিন দরজা, জলে আর কতক্ষণ দাঁড়াব বলুন ?'

আর সন্দেহ নেই। কেশব একহাতে দরজা খুললে, আরেক হাতে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরেছে। বিস্ময়ে বন্দুকটা হাত থেকে খসে পড়ে আর-কি !

সত্যি সত্যিই সামনে মণি দাঁড়িয়ে। মণি হাসিমুখে বললে, 'আমাকে সম্বর্ধনা করবার এই অদ্ভুত আয়োজন দেখছি যে !'

লজ্জায় বিমর্ষ হয়ে কেশব বললে, কিছু মনে করিসনে। এদিকে আজকাল বড্ড ডাকাত পড়ছে, তাই সব সময় এমনি সাবধান হয়েই থাকি। কখন কী হয় বলা যায় না তো !'

মণি বললে, 'তা আমি জানি ! তা জেনেই তো আমি এলাম।

কেশব অবাক হয়ে বললে, 'কোত্থেকে এলি ? এত রাত্রে ট্রেন ?'

'বা, সেই ব্যাণ্ডেল থেকে। আমাদের কী, 'মণি তার সমস্ত শরীরটা বিস্ফারিত করে বললে, আমরা সোজা হেঁটেই চলে আসতে পারি।'

'তোর চাকরি আছে না ?'

মণি খিক-খিক করে হেসে উঠল : 'সে চাকরিটা গেছে। ক'দিন এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করলুম। শুনলুম আপনাদের এখানে বিপদ, তাই ভাবলুম একবার দেখা করে আসি।'

'তা বেশ করেছিস, স্ত্রীকে সম্বোধন করে কেশব পরে বললে, 'ওর কিছু খাবার যোগাড় কর চট করে।'

মণি ব্যস্ত হয়ে বললে, না আমার খিদে নেই। শোবার জন্যে এখন একটা বিছানা পেলেই আমি বাঁচি। আপনারও আর মিছি-মিছি কেন জেগে আছেন? ঘুমোতে যান এবার। ডাকাত এলে আসবে ভয় কী? আমিই তো আছি। আমি তবে এত পথ ভেঙ্গে এলুম কী করতে?'

মণির খুড়ীমা মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'চাকরি খুইয়ে এখন থেকে এইখানেই তবে শেকড় গজিয়ে বসবে নাকি? কাকার ভাত খুব সস্তা পেয়েছ, না?'

'না!' মণি গম্ভীর মুখে বললে, 'কাল ভোরেই আবার আমি চলে যাব ভয় নেই।'

তবে একরাত থেকে তুমি কী এমন সাহসের ভোজবাজি দেখাবে শুনি?' খুড়িমা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন: 'ডাকাতরা তো আর তোমার ফরমাশ মত আসবে না।'

'তবু তো একটা রাত আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারবেন। সেইটেই বা কী কম কথা?' মণি কি-রকম অদ্ভুত করে হাসল? বলল: 'ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসছে, শিগগির বিছানা করে দিন। এই বাইরের ঘরটাই বা মন্দ কি! আমার কিছুতেই আর ভয় নেই।'

খুড়িমা বিছানা পাততে লাগল।

কেশব মণির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললে, 'এত জলের মধ্যে দিয়ে এলি, তবু একফোঁটা ভিজলি না, মণি?'

'সঙ্গে আমার এক বন্ধু আসছিল যে, সে-ই তো তার ছাতায় আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল।' মণি একলাফে বিছানায় শুয়ে পড়ল, আগাগোড়া একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে বললে, 'আপনারাও আর কেন মিছিমিছি জেগে আছেন? নরম ঠাণ্ডা রাত, গা ভরে চমৎকার ঘুম

আসবে। বাইরের ঘরে আমি তো রইলাম পাহারায়—তবে আর কিসের ভয় ?'

'আহা যা একখানা টিঙটিঙে চেহারা, তার বীরত্বের বহর দেখ একবার !' খুড়িমা ঠাট্টার কণ্ঠস্বর বিকৃত করে বললেন, 'খাটের নিচে ছয়েকটা ইঁদুরের গর্ত আগে থেকে খুঁজে রেখো। নইলে চাকরি গেছে, প্রাণটাও যাবে আর কি !'

কাঁথার তলা থেকে মণি বোবা, বিকৃত গলায় হেসে উঠল।

বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ এসেছে মরা মুখের হাসির মত ফ্যাকাশে হয়ে।

কেশবরা তাদের ঘরে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কেমন একটা আতঙ্কিত স্তব্ধতা !

স্ত্রী বললে, ঐ লোকটাকে যে তুমি পরিপাটি করে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলে, সত্যি ও তোমার ভাইপো তো ?'

কেশব ভীত অথচ সস্মিত মুখে বললে, 'বা, মণিকে তুমি চেন না ?'

'চিনি তো। কিন্তু এতদিন বাদে খুড়ো-খুড়ির সঙ্গে দেখা, কাউকে একটা প্রণাম পর্যন্ত করলে না। চেহারা গলার স্বর অবধি কেমন বদলে গেছে। হাত-পায়ের শির উঠে এসেছে, খাড়া-খাড়া চুল, গালে-গলায় হাড় উঠেছে ঠেলে—ভাল করে লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলে তো ?'

কেশবের শিরদাঁড়াটা ভয়ে কনকন করে উঠল। অথচ মুখে সাহস এনে বললে, 'কী যে তুমি বল ! চাকরি-বাকরি নেই, তাই চেহারা এখন দুর্ভাবনায় খারাপ হয়ে গেছে। দেখছ না ডাকাতের ভয়ে আমিই কেমন শুকিয়ে যাচ্ছি। ও কিছু নয়।'

কেশবের স্ত্রী খাটো গলায় বললে, 'কিন্তু এসেই একেবারে লম্বা দিল কেন ? তা-ও মুখ-চোখ ঢেকে,—এমন কী একবারে লম্বা, জিগগেস করি ? তোমাকে বলছি ও মণি নয়। পাছে মণি নয় বলে চিনতে পারি তাই অমনি ঝুপ্ করে কাঁথার তলায় লুকিয়ে পড়ল,

চল, এখন ও হয়ত ঘুমিয়েছে, কাঁথার ঢাকনাটা আস্তে-আস্তে তুলে চেহারাটা ওর একবার দেখে আসি।'

কেশবের গা-হাত-পা শিরশির্ করে উঠল, সোজা গলায় বললে, 'আজ আর নয়, কাল ভোরে।

'কাল ভোরে তো চলেই যাবে। যা ঘটবার তা তো আজ রাতেই --'

কেশব অস্ফুট গলায় চিৎকার করে উঠল: 'এত কথা আগে তবে বলনি কেন?'

কেশবের স্ত্রী কণ্ঠস্বরকে ঝাপসা করে আনল। বললে, 'ও যে-ই হোক, আমার মনে হচ্ছে ও-ই ডাকাত।

'বল কী! বল কী! অন্ধকারে শূন্য চোখ মেলে কেশব বললে, 'ডাকাত গদিতে শুয়ে শুয়ে ঘুম দিচ্ছে কেন?'

'ও আগে থেকে এখানে রয়েছে দলের লোকদের দরজা খুলে দিতে। তুমি দেখো আমার কথা ঠিক হয় কি না। নইলে দেখলে না, কথায়-বার্তায় এমন একখানা ভাব দেখালো যেন আজ রাত্রে আমাদের বাড়িতে ডাকাতি হবে বলেই ও এসেছে। কী করে জানল ও এত কথা? আর কী বড়ফাট্রাই, আমাদের উনি বাঁচাবেন! সবংশে শেষ করে দেবার মতলব!'

কেশব যেন বন্দী, অসহায় একটা পশুর মত গর্জে উঠল: 'এখন কী করা যায়?'

কেশবের স্ত্রী ঝামটা মেরে উঠল: 'ঘুমুনো ছাড়া কী আর করা যাবে? সারা জীবন তো কেবল নাকে তেল দিয়েই ঘুমুলে!'

কেশব দেয়ালের দিকে আরো একটু ঘন হয়ে সরে বসল। বললে, 'তুমি বলতে চাও মণি আমার এই সর্বনাশ করবে। আমি যাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করলাম।'

'মণি কি না তাই বা কে জানে! আর কাটুক না খানিকটা রাত!'

আরো খানিকটা রাত কাটল। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। বাইরের ঘরটা ঘুমে একেবারে মুছে গেছে। একটি নিঃশ্বাস পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে থাকতে কেশবের হালকা একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ তুমুল একটা গোলমালে তার হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে গেল। গোলমালটা যে কিসের, স্পষ্ট সে কিছু ধারণা করতে পারল না। স্তম্ভিত হয়ে একতাল মাংসের মত বসে রইল। মনে হল মরবার আগ মুহূর্তে মানুষ বুঝি এমনি নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

তার গায়ে একটা ধাক্কা মেরে তার স্ত্রী বললে, 'শুনতে পাচ্ছ না, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে!'

কেশব মূর্ছাহতের মত বললে, 'কোথায়?'

গোলমালটা ঠিক আক্রমণের জয়োল্লাস নয়, যেন পলায়মান কতকগুলি লোকের ভীত-কাতর আর্তনাদ। গোলমালটা বাড়ির মধ্যে না এসে ক্রমশ যেন দূরে সরে যাচ্ছে। ব্যাপার কী!

কেশব সাহস পেয়ে বলে উঠে: 'বন্দুক আমার বন্দুক।'

বন্দুকের দরকার ছিল না, চিৎকারটা তখন রাস্তা ছেড়ে মাঠে পড়েছে।

বাইরের ঘরে এসে কেশব জানালা খুললে। বৃষ্টির পর আকাশে তখন ঘোলাটে একটু জ্যোৎস্না ফুটেছে। সেই আবছা-আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল একদল লোক উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়ার চেয়েও দুর্দান্ত বেগে। এক একবার তারা পেছন ফিরে তাকায়—কী দেখে তারা কে জানে—আবার মাঠের উপর দিয়ে এলোপাথাড়ি ছুটতে থাকে।

'ঐ এল ঐ এল ধরতে'—সবার মুখে সেই ভয়ার্ত চিৎকার।

কেশবের স্ত্রী বললে, 'এত গোলমাল, রাস্তায় লোকজন জমে গেল, আর তোমার বীর ভাইপোর এখনও ঘুম ভাঙল না! উনি এসেছিলেন আমাদের ধনে-প্রাণে রক্ষা করতে।'

কেশব খাটের কাছে এগিয়ে এসে হুঙ্কার দিলে : 'মণি।'

কাঁথাটা কোথাও একটুকু কুঁচকালো না পর্যন্ত।

'মণি!'

কে কাকে ডাকছে।

কেশব একটা হেঁচকা টানে কাঁথাটা তুলে ফেলল। কোথায় মণি! সমস্ত বিছানাটা যেমনি সাদা, তেমনি পরিপাটি। কোথাও একটা রেখা পর্যন্ত নেই।

কী ব্যাপার!

বাইরে এসে দেখা গেল, ডাকাত সত্যিই এসেছিল। অনেক সব চিহ্ন তারা ফেলে গেছে—ছোরা, শাবল, মুখোস, লোহার ছোট-ছোট ডাণ্ডা। একজন এমনকি একপাটি জুতো, পালাবার তাড়ায় কারুরই কোন দিশে ছিল না। কিন্তু মণি গেল কোথায়?

কেশবের স্ত্রী বললে, 'এই সামান্য ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না? বীটের পুলিশ কোথাও এদিকে টহল দিচ্ছিল, হয়ত, তাই দেখে ডাকাতরা চোঁচা ছুটে পালিয়েছে। আর উনি তোমার মণি হচ্ছেন ডাকাতের দলের সর্দার—কী করে আর শুয়ে থাকেন বল, ওদের সঙ্গে উনিও দিলেন দৌড়।'

কেশব হতভম্ব হয়ে বললে, 'তাই হবে।'

'তাই যদি না হবে তবে ও ফিরে আসত না? ডাকাত তাড়িয়ে দেবারই যদি ওর মুরোদ থাকত তবে নিজেও সে সেইসঙ্গে পালিয়ে যাবে কেন?'

'ঠিক বলেছ, নইলে ও-ই বা সেই সঙ্গে পালিয়ে যাবে কেন?' কেশবের এতক্ষণে বুদ্ধি খেলল। পরে ঢোক গিলে বলল, 'কিন্তু কিছু নেবার চেষ্টা না করে দল-কে-দল পগার পার হয়ে গেল, এ-ও একটা রহস্য বটে।'

'রহস্য না হাতি!' কেশবের স্ত্রী মুখ ঘুরিয়ে বলল : 'না পালালে দেখতে কখন ঐ তোমার ভাইপোটিই তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিত।

দেখ না, আসুক না পুলিশ, দলের সর্দারকে যখন চিনতে পেরেছি তখন আর ভাবনা নেই।'

সকালবেলা যথাসময়ে পুলিশ এল।

কেশব মণীন্দ্রের নাম-ধাম জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সব পরিচয় দিয়ে হঠাৎ বেদনায় উল্লাসিত হয়ে উঠল : 'কী দারুণ অকৃতজ্ঞ ভাবুন! আমিই তাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিলুম, আর এসেছিল আমার বুকে ছুরি বসাতে! তাকে দিলুম আশ্রয়, আর তার কিনা এই ছিল মতলব—'

কেশবের স্ত্রী ঘর থেকে মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল : 'আমি তো তখনই বলেছিলুম!'

'ডাকাতের সর্দার! ওর দশটি বছর জেল চাই, দারোগাবাবু! হাড়ে-হাড়ে শয়তান, নইলে কোনদিন কেউ খুড়োর বুকে ছুরি তুলতে পারে? হ্যাঁ, ঐ ছুরি প্রায় বুকে বসাচ্ছিল আর কী, এক ইঞ্চি নামলেই সাবাড়—ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!'

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন : 'আপনি কী করলেন?'

কেশব লাফিয়ে উঠল : 'বন্দুক, আমার বন্দুক আছে না? খপ্ করে তাই উঁচিয়ে ধরলুম। ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, মুখ থেকে মুখোস গেল খসে। দেখলুম মণীন্দ্র। ব্যাণ্ডেলে সে কাজ করে, আমার আপন ভাইপো। রাতে যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখি। চিনতে দেরি হবে কেন?'

'তারপর?'

'ছুট দিল লম্বা। যা ছিল যন্ত্রপাতি, সব গেল ফেলে!' কেশব গর্বে টগ্‌বগ্ করে উঠল : 'বন্দুকের সঙ্গে পারবে কেন? ঘোড়াটা টিপতে গেলুম দারোগাবাবু, পারলুম না। শত হলেও তো নিজের বংশের রক্তপাত—

কেশবের স্ত্রী ঘর থেকে খেঁকিয়ে উঠল ; 'বা, আমিই তো বারণ করলুম বন্দুক ছুঁড়তে!'

'হ্যাঁ,' কেশব মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, 'বলার তো আর অপেক্ষা রাখে না ! ওঁর পরামর্শ শুনেই আমাকে কাজ করতে হয় !'

দারোগাবাবু বললেন, 'কিছু নিতে পারেনি তো ?'

'নেবে ?' কেশব বুক চিতিয়ে দাঁড়াল : 'নিক্ না, দেখি না তার কতখানি বুকের কত বড় পাটা !'

দারোগাবাবু যন্ত্রপাতি সব কুড়িয়ে নিলেন থানায় জমা দিতে। বললেন, 'ওদের সহজেই ধরে ফেলতে পারব। অনেক সব ক্লু পেয়ে গেলাম—এর আগে কোথাও একটা পায়ের দাগ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অথচ বন্দুক সব বাড়িতেই ছিল।'

কেশব অহংকারে স্ফীত হয়ে বললে, 'বন্দুক থাকলেই তো চলে না তাকে বাগিয়ে ধরবার কায়দা জানা চাই।'

দারোগাবাবু যাবার আগে বললেন, 'এ গ্যাঙ ধরতে পারলে দেশের একটা খুব স্থায়ী উপকার করা হবে, কেশববাবু। আপনার সাহস ও কৌশলকে পুরস্কৃত করতে পারলে আমরা খুশী হব। আপনার ভাইপোর খোঁজে আজই আমরা ব্যাণ্ডেলে লোক পাঠাচ্ছি। আর এই যে এক পাটি জুতো দেখছেন, তা থেকে এর মালিককে খুঁজে পেতে আমাদের দেরি হবে না।'

আবার রাত এল ঘনিয়ে। আজকে আর বৃষ্টি নয়, ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না ! দিয়েছে এলোমেলো হাওয়া !

লণ্ঠন নিবিয়ে কেশব বাইরের ঘরে তার মশারির মধ্যে এসে ঢুকল। চারিদিক ভাল করে গুঁজে সে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। হঠাৎ দেখতে পেল মশারির ভিতর ঠিক তার গলার উপর কার একটা হাত। তেমনি রোগা, শিটে লিক্‌লিকে ! আঙুলগুলি সাপের মত পিছল, আঁকাবাঁকা। আঙুলগুলি তার গলার উপর আলগোছে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

প্রাণপণে চোখ বুজে সমস্ত শরীর কঠিন করে কেশব চেঁচিয়ে উঠল, 'কে ?'

মশারির বাইরে থেকে স্পষ্ট উত্তর এল : 'আমি ! চিনতে পাচ্ছেন না ! এই দেখুন কব্জির দাগ।'

কেশব ভয়ে-ভয়ে চোখ মেলল। মশারির বাইরে কারু কোন অস্তিত্বের আভাস নেই।

'বন্দুক, আমার বন্দুক ?' কেশব ধড়মড় করে উঠে বসল। নামতে গেল খাট থেকে। মশারি তুলতে যাবে, অমনি আবার তার বুকের উপর সেই হাতটা লোলুপ হয়ে উঠল। কে বললে, 'আমিই আপনাকে খুন করতে এসেছিলাম, না ? আমি খুবই অকৃতজ্ঞ ?'

স্পষ্ট, পরিচিত গত রাত্রির কণ্ঠস্বর।

কিন্তু চোখ কচলে কেশব চেয়ে দেখল, ঘরে-বাইরে ঝিম্ ঝিম করছে শূন্যতা !

'বন্দুক, আমার বন্দুক নিয়ে এস শিগগির !' কেশব স্খলিত পায়ে নিচে নেমে এল। ছুটে গেল দরজার দিকে। পা-দুটো নিমেষে পাথর হয়ে গেল—দরজার কাছে একটা চেয়ার টেনে মণি গা এলিয়ে বসে আছে।

'একি, মণি যে ! তুমি কোত্থেকে ?' কেশব একেবারে বসে পড়ল।

মণি নির্লিপ্ত গলায় বললে, 'কাল যেখান থেকে এসেছিলাম।'

'কী মনে করে এসেছ জিজ্ঞেস করতে পারি ?'

'ধরা দিতে এসেছি। আপনি থাকতে পুলিশ কেন আর কষ্ট করে ধরে বলুন ? পুরস্কারটা আপনারই হোক।'

'আহাহা, সে কী কথা ! তুমি আমার ভাইপো ! তোমাকে ধরিয়ে দেব কী ? বস, তোমার খুড়িমাকে ডেকে আনি।' কেশব ভিতরে চলে যাচ্ছিল, দরজার উপর আবার সেই হাত ঝুলছে।

'বন্দুক আনতে যাচ্ছেন ?' মণি হেসে উঠল ; 'তার দরকার নেই। বন্দুকে আমার কিছু করতে পারবে না। বসুন, একটা কথা বলি।'

কেশব কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'কী ?

'কাল আমিই ডাকাতদের তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। আপনি আমাকে মানুষ করেছিলেন সেই কথা আমি ভুলিনি।'

'কিন্তু কী করে তাড়ালে ?' কেশব ভয়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে।

'আমি ম্যাজিক জানি।' মণি তেমন অনর্গল হেসে উঠল : 'সেই ম্যাজিক দেখাতেই তারা চম্পট দিল। দেখবেন সেই ম্যাজিক ?'

দেয়ালের দিকে কেশব তার দৃষ্টিহীন শূন্য দুটো চক্ষু তীক্ষ্ণ করে তুলে ধরল।

হঠাৎ সমস্ত দেয়াল-ছাদ বিদীর্ণ করে কেশবের গলা থেকে প্রবল একটা চিৎকার বেরুল। মণি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মাংসল মূর্তিটা ধীরে ধীরে শুকনো, সাদা, কঠিন, উলঙ্গ কঙ্কালে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে—পা, হাত, দাঁত, খুলি। এক একটা করে মাংসপিণ্ড ঝরে পড়ছে আর তার স্বর হয়ে আসছে অস্পষ্টতর : 'আমি আপনার এমন একটা উপকার করলুম, আর আপনি দিলেন আমাকে এই অকৃতজ্ঞতার অপবাদ! ডাকুন খুড়িমাকে—দূর থেকে হাওয়ায় একটা হাসির আলোড়ন শোনা গেল : দেখে যান আমার এই টিঙটিঙে দুর্বল দেহ কী ভয়ঙ্কর শক্তি ধরে! দেখে যান আমি সত্যি ডাকাত তাড়াতে পারি কি না!'

হাওয়ায় সেই খণ্ড-খণ্ড সাদা হাড়গুলি হাহাকার করে উঠল।

শিগগিরই পুলিশ-রিপোর্ট পাওয়া গেল অবিশ্যি। ফেলে যাওয়া নিদর্শনগুলি থেকে ডাকাত-দল ধরা পড়েছে বটে,কিন্তু কোথায় তাদের সর্দার! মণীন্দ্রের খোঁজ পাওয়া গেল না। সে পলাতক—পৃথিবী থেকে পলাতক। ব্যাণ্ডেল স্টেশন ছাড়িয়ে হঠাৎ এক রাত্রে লাইন পেরোতে গিয়ে ট্রেনে সে কাটা পড়েছে। কিন্তু তা নাকি ঘটনাটার ক-দিন আগে।

খবর পেয়ে কেশব আর তার স্ত্রী গলা ছেড়ে কাঁদতে বসল। অবাক হয়ে চেয়ে দেখল, চোখে আর একফোঁটা কান্না নেই, সেইকাটা হাতটা তাদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে এগিয়ে আসছে। কাঁদতে বসাও বিড়ম্বনা।

পিণ্টু

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



আমার একটা দু'নলা বন্দুক আছে। বারো বোরের বন্দুক—ব্রীচ্ লোডিং—অর্থাৎ গাদা বন্দুক নয়। দেশী মিস্ত্রী এই বন্দুক তৈরী করেছে—কিন্তু এত সুন্দর জিনিস যে বিলিতি বন্দুকের চেয়ে কোনো অংশে খারাপ নয়। দেড়শো গজ পর্যন্ত তার পাল্লা—Point blank-এ দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁস মারা যায়, যদিও এটা হাঁস মারা বন্দুক—duck gun—নয়। এই বন্দুকটি আমার বড় প্রিয়।

পাখি শিকার করতে আমি ভালবাসতুম। শীতকালে যখন খালে-বিলে নানা জাতের হাঁস পড়তে আরম্ভ করত তখন আমি বন্দুক কাঁধে করে বার হতুম। সে সময় আমার সঙ্গী থাকত কেবল আমার কুকুর—পিণ্টু। পিণ্টু খাঁটি দেশী কুকুর—তার গায়ে এক ফোঁটাও বিলিতী রক্ত ছিল না—ইচ্ছে করলে তোমরা তাকে নেড়ি-কুত্তাও বলতে পার। তার চেহারাটি ছিল রোগা, গায়ে সাদা-কালো ছাপ, মুখটি ছুঁচলো, চোখে একটি লজ্জিত সঙ্কুচিত ভাব। সত্যি কথা বলতে কি, পিণ্টু খুব সাহসী কুকুর ছিল না: ভিনপাড়া দিয়ে যাবার সময় তার ল্যাজটি অলক্ষিতে পিছনের পা দুটির ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করত, আর পাড়ার কুকুরগুলো যখন ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসত তখন সে কেবলই আমার পাশে ঘেঁষে-ঘেঁষে আসত আর গলার মধ্যে 'গর্‌র্' শব্দ করত। দাদা বলতেন—'শুধু দুধ-ভাত খেতে খেতেই পিণ্টুর সব সাহস মিইয়ে গেছে। কিন্তু সে যাই হোক, পিণ্টুর একটি

অসাধারণ গুণ ছিল। সে খুব ভালো মরা পাখি উদ্ধার করতে পারত। গুলি খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেখানেই পড়ুক—জলে, স্থলে কিম্বা পাঁকের মধ্যে—পিণ্টু ঠিক তাকে মুখে করে নিয়ে আসবে। ইংরেজিতে এই জাতের কুকুরকে বলে retriever। একবার এক সাহেব পিণ্টুর আশ্চর্য গুণপনা দেখে দুশো টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে কিনে নিতে চেয়েছিল। আমি দিইনি।

যা হোক, শীতকাল এলেই আমরা দু'জনে শিকারে বার হতুম। এমন অনেকবার হয়েছে যে পাখির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি, দু'তিনি দিন বাড়ি ফেরাই হলো না। আমার শিকারের সখ তখন সকলে জানতেন, তাই উদ্বিগ্ন হতেন না।

গত বছর শিকার করতে গিয়ে কি ব্যাপার হয়েছিল সেই কথাই আজ বলব।

খবর পেলুম শহর থেকে মাইল-কুড়ি দূরে যে জলা আছে তাতে বিস্তর হাঁস পড়েছে। হাঁসগুলো আশপাশের ধানক্ষেতের ক্ষতি করছে। মন উৎসুক হয়ে উঠল। অগ্রাণ মাস—বেশ শীত পড়েছে—একদিন সকালবেলা পিণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অজ পাড়াগাঁয়ে গাড়ি যাবার রাস্তা নেই—যেতে হলে এক গরুর গাড়ি চড়ে যেতে হয়। আমরা পায়ে হেঁটেই গেলুম, কারণ গরুর গাড়ি চড়ে কাঁচা রাস্তার ওপর দিয়ে বিশ মাইল যাওয়ার চেয়ে হেঁটে যাওয়া ঢের বেশী স্বাস্থ্যকর। অন্তত হাড়গুলো আস্ত থাকে।

জলার নিকটবর্তী গ্রামে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যা হয়-হয়—পশ্চিম আকাশের একটুখানি সোনালী আলো ঝিলমিল করছে। দূর থেকেই অসংখ্য হাঁসের কলকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলুম। হাঁসের ডাক সকলের ভালো লাগে কি না বলতে পারি না, কিন্তু আমার বড় মিষ্টি লাগে। দেহের ক্লান্তি সত্ত্বেও মনটা আনন্দে নেচে উঠল। পিণ্টুও আমাকে ঘিরে আনন্দে নাচতে লাগল আর ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল।

গ্রামে বেশির ভাগই নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস, কিন্তু একটি ছোট্ট পোস্টঅফিস ছিল। তারই পোস্টমাস্টারের বাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করলুম। তিনি ভারি ভদ্রলোক—গরম চা এবং প্রচুর জলখাবার দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। গরম-গরম খাদ্যদ্রব্য পেটে পড়তেই শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

নানারকম কথাবার্তায় ক্রমে রাত্রি হয়ে গেল, পূবের আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। আমি তখন পোস্টমাস্টার বাবুকে বললুম—এবার বেরুনো যাক। কোন দিক দিয়ে গেলে সহজে জলায় পৌঁছুনো যাবে আমাকে দেখিয়ে দিন।

আমার কাঁধে বন্দুক দেখেই পোস্টমাস্টার বুঝেছিলেন যে, আমি শিকার করতে এসেছি. কিন্তু আমি যে রাত্রেই পাখি মারতে বেরুব তা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন—রাত্তিরে পাখি মারতে যাবেন ?

আমি বললাম,—হ্যাঁ,—রাত্তিরেই তো পাখি মারবার সুবিধে—দেখছেন না, কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে।

পোস্টমাস্টার একটু ভয়ে-ভয়ে বললেন,—কিন্তু রাত্তিরে জলার দিকে যাবেন ? সন্ধ্যার পর ওদিকে কেউ যায় না।

সেকি ! কেন ?

তিনি কুণ্ঠিতভাবে বললেন,—কি জানি মশায়, আমি চোখে কিছু দেখিনি। শুনতে পাই জলায় নাকি অপদেবতা আছে।

আমি হেসে উঠলুম,—অপদেবতা ! সে আবার কি ?

তিনি বললেন,—তা জানিনে মশাই ,তবে শুনেছি শরবনের মধ্যে নাকি পেত্নী আছে .

আমি হাসতে লাগলুম, বললুম—তা থাক পেত্নী। আমার হাতে বন্দুক আছে দেখলে সে নিজেই ভয়ে পালিয়ে যাবে।

তিনি মাথা নেড়ে বললেন,—বোধহয় উচিত নয় ! একবার এক

সাহেব আপনার মতন রাত্তিরে জলায় শিকার করতে গিয়েছিল, সে আর ফিরে আসেনি।

আমি বললুম,—কোন ভয় নেই—আমি এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসব। আপনি শুধু আমায় পথটা দেখিয়ে দিন।

তিনি তখন অনিচ্ছাভরে গাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত এসে আমায় জলা দেখিয়ে দিলেন। জলাটা সেখান থেকে মাইল-খানেক দূরে—চাঁদের আলো তার ওপর ঝক্-ঝক্ করছে আর ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট পাখির সারি তার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।



চাঁদিনী রাতে জলার ধারে কি করে পাখি শিকার করতে হয় তা বোধ হয় সকলে জানে না। অথচ ব্যাপারটা খুব সহজ—এমন কি, দিনের বেলা পাখি শিকার করার চেয়েও সহজ। রাত্রে জলার পাখিরা চোখে ভাল দেখতে পায় না। কিন্তু কেবলই উড়ে বেড়ায়—জলার এধার থেকে ওধারে যায়, আবার এধারে ফিরে আসে। তাই

চাঁদ যখন গাছের ডগা ছাড়িয়ে ওঠে তখন সেই চাঁদের দিকে লক্ষ্য রেখে বন্দুকে টোটা ভরে কোনো ঝোপের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পাখির সার যখন ওপর দিয়ে উড়ে যায় তখন চাঁদ লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়তে হয়। ছর্‌রা খেয়ে পাখিগুলো ধপ-ধপ করে মাটিতে পড়ে। তখন কুকুর গিয়ে সেগুলোকে খুঁজে নিয়ে আসে। এ রকম শিকারের সুবিধা এই যে, পাখির পিছন-পিছন ঘুরে বেড়াতে হয় না, এক জায়গায় দাঁড়িয়েই অনেক পাখি পাওয়া যায়।

যা হোক, আমি আর পিন্টু আলের ওপর দিয়ে জলার দিকে চললুম। বেশ একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। কিন্তু আমার গায়ে গরম কোট থাকায় ভালোই লাগল। পকেটে গোটা-কুড়ি চার নম্বরের কার্তুজ নিয়েছিলুম—আশা ছিল তাতেই কাজ চলে যাবে।

ক্রমে জলার কাছে এসে পড়লুম। এখনকার মাটি নরম, মাঝে-মাঝে জল সরে গিয়ে আধ-শুকনো পাঁকও রয়েছে। জলাটা প্রকাণ্ড—একটা হ্রদ বললেও চলে, কিন্তু জল খুব গভীর নয়। তার কিনারা ঘিরে বন-শরবন জন্মেছে, মাঝখানেও স্থানে স্থানে শরের গোছা উঁচু হয়ে আছে। চাঁদের আলোয় সমস্ত দৃশ্যটা এমন অস্পষ্ট হয়ে আছে—যেন পৃথিবীর আদিম যুগের তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রকৃতির চিত্র—দেখলে প্রাণের ভিতরটা কেমন করে ওঠে।

জলের কিনারা পর্যন্ত যাবার কোনো দরকার ছিল না, চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম কতকগুলো কাঁটাগাছের শুকনো ঝোপ ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। তারই মধ্যে একটা বেছে নিয়ে আমি তার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালুম। বন্দুকে টোটা ভরে পাখির জন্যে তৈরী হয়ে রইলুম। এইবার পিন্টুর চালচলন লক্ষ্য করলুম। সে এতক্ষণ বেশ লাফালাফি করতে-করতে আমার সঙ্গে আসছিল কিন্তু এখানে এসেই কেমন যেন জড়সড় হয়ে গেল! তার ল্যাজটি করুণভাবে পায়ের মধ্যে প্রবেশ করল, সে শঙ্কিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে একটা ক্ষীণ কুঁই কুঁই শব্দ করতে লাগল।

চারিদিক চেয়ে দেখলুম, অন্য কোনো কুকুর বা ভয়াবহ কিছুই নেই। ভাবলুম, জলার ধারে ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিশ্চয় তার শীত করছে, তাই অমন করছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলুম। জলার কিনারা দিয়ে একটা খট্-খট্-খট্ শব্দ ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসছে—যেন একটা বিকট হাসির আওয়াজ! কিন্তু তখনই বুঝতে পারলুম যে অস্বাভাবিক কিছু নয়, শরবনের মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইছে। এই খট্-খট্ শব্দ ক্রমে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল, দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল—কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসের মত একটা শব্দ তখনো শরবনের ভিতর থেকে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। আমার ভারি হাসি পেল—এইসব শব্দ শুনেই বোধহয় গাঁয়ের লোকেরা ভয়ে এদিকে আসে না।

আবার শব্দ! এবারের শব্দ এমনি অপার্থিব যে শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বহুদূরে জলার বুক থেকে একটা দীর্ঘ কান্নার সুর, যেন কোন স্ত্রীলোক কেঁদে উঠল—আহা—হা—হা—হা—চারিদিকে, প্রতিধ্বনি তুলে এই কান্না ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেল।

জলাতে অনেক রকম আজানা পাখি থাকে, মনে হলো হয়ত তাদেরই কেউ অমন করে কেঁদে উঠল। কিন্তু আমি অনেক পাখি মেরেছি, অনেক ঝিলে-জঙ্গলে বেড়িয়েছি, এরকম পাখির ডাক কখনো শুনিনি। একবার মনে হলো—পাখি বটে তো? পিণ্টুর দিকে তাকিয়ে দেখি সে আমার গা-ঘেঁষে এসে বসেছে আর তার শরীর থর-থর করে কাঁপছে। আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে বললুম,—কিছু ভয় নেই পিণ্টু—ও পাখির ডাক।

পিণ্টু করুণভাবে আমার দিকে তাকাল, তারপর উঠে গাঁয়ের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যগ্র চোখে আমার পানে চেয়ে রইল। কুকুর কথা কইতে পারে না, কিন্তু পিণ্টু যেন পরিষ্কার

আমাকে বললে,—ফিরে চল, এ বড় খারাপ জায়গা, এখানে থাকতে নেই।

হায়! পিন্টুর কথা যদি শুনতুম!

হাতের ঘড়িতে দেখলুম, সাড়ে ন'টা বেজেছে। এই সময় আকাশে শন্-শন্ শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি এক ঝাঁক পাখি—বোধহয় মোরগাবি, কারণ মোরগাবিরা এত জোরে ওড়ে যে তাদের ডানায় সাঁই-সাঁই আওয়াজ হয়—ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে ফায়ার করলুম—চারিদিকে একটা বিকট প্রতিধ্বনি উঠল। তারপরে ধপ্ করে একটা শব্দ হল। বুঝলুম, পাখি পড়েছে।

পাখি পড়ার শব্দে পিন্টুর ভয় কেটে গেল, সে কান খাড়া করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর লাফাতে-লাফাতে যেদিকে পাখি পড়েছিল সেইদিকে ছুটল।

পাখিটা পঞ্চাশ হাত দূরে একটা ঝোপের মধ্যে পড়েছিল, পিন্টু সেই ঝোপের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর চোঁ-চোঁ করে পালিয়ে এসে আমার জুতোর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে পড়ল! আশ্চর্য হয়ে বললুম,—কি হয়েছে পিন্টু? পালিয়ে এলি যে? তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি ঘাড়ের রোঁয়া কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে।

পিন্টু কখনও এরকম করে না, তাই ভারি আশ্চর্য হয়ে আমি নিজেই সে ঝোপটার দিকে অগ্রসর হলুম। কাঁটাগাছের ঝোপে পাতা নেই, তার ভিতরে পরিষ্কার চাঁদের আলো পড়েছে। ঝোপের দশ হাতের মধ্যে গিয়ে আমিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দেখলুম, মরা-পাখিটা মাটিতে পড়ে রয়েছে, আর সাদা-কাপড়-পরা একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি তার ওপর ঝুঁকে পড়ে যেন তাকে আগলে রয়েছে।

এই সময় আবার সেই তীব্র কাতরোক্তি ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল—আহা—হা—হা—

ভয়ের একটা শিহরণ আমার হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। কে ও? মানুষ না আর কিছু? অমন করে কেঁদে উঠল কেন?

প্রাণপণে ভয় দমন করে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কে?

আবার সেই বুক-ফাটা কান্না—আহা—হা—হা—হা—

আমি জড়মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলুম। ইচ্ছে হলো পালাই, কিন্তু পালাতে পারলুম না। আমার দুই চোখ সেই ঝোপের মধ্যে নারী-মূর্তির ওপর নিবদ্ধ হয়ে রইল।

হঠাৎ নারীমূর্তি উঠে দাঁড়াল, ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। আমি তার মুখ দেখতে পেলুম না, সর্বাঙ্গ কুয়াশার মত সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। সে একটা সাদা হাত তুলে আমায় ডাকলে, তারপর নিঃশব্দে চলে যেতে লাগল।

খানিক দূর গিয়ে সে ফিরে দাঁড়াল, তারপর আবার হাত তুলে আমায় ডাকলে। আমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি যেন একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কলের পুতুলের মত তার পিছন-পিছন চললুম।

পিণ্টু এতক্ষণ অনেক দূরে পেছিয়ে ছিল, এবার সে ছুটে এসে আমার পা কামড়ে ধরলে। ভয়ে তার গা কাঁপছে, শরীর যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে, তবু সে আমায় ফেলে পালাতে পারছে না। আমার পা কামড়ে ধরে পিছন দিকে টানতে লাগল, যেন কিছুতেই আমাকে যেতে দেবে না।

কিন্তু চুম্বকের আকর্ষণ লোহাকে যেমন টেনে নিয়ে যায়, আমিও তেমনি অন্ধভাবে সেই মূর্তির অনুসরণ করলুম। পিণ্টু পদে-পদে বাধা দিতে লাগল, পায়ের কাছে পড়ে কেঁউ-কেঁউ করে মিনতি জানাতে লাগল, কিন্তু আমার গতিরোধ করতে পারল না।

ক্রমে ক্রমে তলতলে নরম পাঁকের ওপর এসে পড়লুম। সে যে কী ভয়ঙ্কর জিনিস তা বর্ণনা করা যায় না। আর এই পাঁকে আস্তে আস্তে ডুবে মরার মত ভয়াবহ মৃত্যুও কল্পনা করা কঠিন। আমি কিন্তু কোথায় যাচ্ছি কিছুই জ্ঞান ছিল না, কেবল সেই মূর্তির দিকে চোখ রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু ক্রমে যখন পাঁকের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যেতে লাগল তখন দাঁড়িয়ে পড়লুম। মূর্তিও সামনে খানিক দূরে দাঁড়াল। তারপর

আবার সেই রক্ত-জল-করা আওয়াজ—আহা—হা—হা—হা! এবার কিন্তু কান্না নয়, মনে হলো যেন সে একটা পৈশাচিক প্রতিহিংসার হাসি হাসছে।

আমি আর এগিয়ে যাচ্ছি না দেখে মূর্তি দু'এক পা ফিরে এল, খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। ওদিকে আর বেশী এগোলে এই অতল পাঁকের মধ্যেই ডুবে যাব বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু তবু ঐ হাতছানি অমান্য করবার সাধ্য নেই। বন্দুকটা এতক্ষণ হাতেই ছিল, এবার ফেলে দিলুম। তারপর পাগলের মত সেই পাঁকের ভিতর দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চললুম।

পিণ্টু! এই সময় পিণ্টু যে অদ্ভুত কাজ করলে তা জীবনে কখনো ভুলব না। সে এতক্ষণ আমার পিছন-পিছন আসছিল, কিন্তু যখন দেখলে যে আমি উরু উর্ধ্বস্ত কাদায় ডুবে যাচ্ছি তখন সে হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার করে আমার সামনে এল। আমি দেখলুম, তার সর্বাঙ্গের রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠেছে আর সে হিংস্রভাবে দাঁত বার করে সেই মূর্তির পানে ছুটে চলেছে।

সাদা মূর্তিটার সামনে পৌঁছে সে তার কণ্ঠ লক্ষ্য করে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা আর্ত-কম্পিত চিৎকার পিণ্টুর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল। যাকে লক্ষ্য করে সে লাফ দিয়েছিল সেই মূর্তি হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পিণ্ট কোথাও বাধা না পেয়ে কাদায় পড়ে গেল। আর উঠল না।

পিণ্টু! পিণ্টু!—আমি আত্মহারার মত ছুটে গেলুম যেখানে পিণ্টু পড়েছিল। সেখানে পাঁক তত গভীর নয়, তলায় শক্ত মাটি আছে। পিণ্টুর নিশ্চল দেহ দু'হাতে তুলে নিয়ে দেখলুম, তার দেহে প্রাণ নেই—সে মরে গিয়েছে। সেই যে ভয়ার্ত চিৎকার—তারই সঙ্গে সঙ্গে পিণ্টুর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছে।

চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, সেই সাদা মূর্তি কোথাও নেই—যেন

জলাভূমি থেকে উত্থিত একটা দুষ্ট বাষ্প আবার জলাভূমিতেই মিলিয়ে গিয়েছে।

পিণ্টু। পিণ্টু। বলে তার কাদা-মাখা শরীর বুকে জড়িয়ে নিয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে জ্ঞান হলো। তখনো পিণ্টুর মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে আছি।

সারা গায়ে ব্যথা আর ১০২ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে একলা বাড়ি ফিরে এলুম। ক্রমে সেরে উঠলুম। এখনও মাঝে-মাঝে শিকারে যেতে মন চায়।

যখন মনে হয় পিণ্টু আমার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে—দারুণ ভয়ে তার বুকের স্পন্দন থেমে গেছে কিন্তু তবু তার ভালবাসা এক তিল কমেনি—তখন কান্নায় বুক ভরে ওঠে।

পিণ্টু সাহসী কুকুর ছিল। কিন্তু দরকারের সময় তার মতো সাহস ক'জন দেখাতে পেরেছ?

গল্পের শেষে

প্রেমেন্দ্র মিত্র



বর্ষাকাল, সুতরাং বৃষ্টি তো হবেই। কিন্তু সারাদিন সমানে জল পড়বার পর রাত্তিরেও তার বিরাম হবে না জানলে আমরা বোধ হয় সেই কলকাতা ছেড়ে এই পাড়াগাঁয়ে ফুটবল খেলার লোভে আসতাম না।

জায়গাটা যে এমন পাণ্ডববর্জিত দেশ তাই-বা কে জানত। খবরের কাগজে নসীপুরে 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের' নাম দেখে ভবেশ একটা এন্টি করে দিয়েছিল। ভবেশ আমাদের 'দি আন্‌বীট্‌ন ইলেভ্‌ন' ছ-মাসের পরমায়ুতে এ পর্যন্ত কাউকে পরাস্ত করতে পারেনি, সে-দিক দিয়ে আমাদের রেকর্ড আন্‌বীট্‌ন সত্যিই। চাঁদা দেওয়া ও একবার করে মাঠে নামাই সার। কিন্তু ভবেশের উৎসাহ তাতে কমবার নয়।

গোড়ার দিকে কলকাতার একটু-আধটু নামকরা 'শীল্ড' বা 'কাপে'ই নামতে গিয়ে আমাদের একটু অসুবিধা হয়েছে এ-কথা স্বীকার করা ভালো। দর্শকেরা আমাদের খেলায় উৎসাহিত হয়ে এমন হাততালি দিতে শুরু করেছে যে, খেলা শেষ হয়ে গেলেও থামেনি। অনেকে হাততালি দিতে-দিতে আমাদের পেছনে বাড়ি পর্যন্ত এসেছে এ আমার নিজের চক্ষে দেখা। আমরা হেরে গেলেও খুব খারাপ খেলি না। কিন্তু ভালো খেললেও এতটা আমাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। শেষের দিকে তাই কলকাতা ছাড়িয়ে

মফঃস্বলের শহর এবং মফঃস্বলের শহর ছাড়িয়ে পাড়াগাঁয়ের দিকে আমাদের ঝোঁক একটু বেশী হয়েছে।

কিন্তু পাড়াগাঁয়েরও একটা সীমা আছে—নসীপুর তার বাইরে। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড'-এর কর্মকর্তারা আমাদের চাঁদা পেয়ে খুশী হয়ে জানিয়েছিলেন যে স্টেশন থেকে এক পা গেলেই তাঁদের ক্লাব ও খেলার মাঠ। আমাদের কোন কষ্ট হবে না। স্টেশনে তাঁরা লোকও রাখবেন।' লোক বলতে 'স্টেশনমাস্টার', তা এক পা বলতে 'ঘটোৎকচের পা' যেটুকু তাঁরা উহ্য রেখেছিলেন।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভিতর তিনটে নাগাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে গিয়ে যখন নসীপুরে নামলাম, তখন প্রথমে তো মনে হলো গাড়ি বোধ হয় সিগন্যাল না পেয়ে মাঠের মাঝে থামতেই আমরা ভুল করে নেমে পড়েছি। এ আবার স্টেশন নাকি? প্ল্যাটফর্ম না থাক, মাটিতে খানিকটা লাল কাঁকরও তো বিছানো থাকে। হুড়মুড় করে আবার ট্রেনে উঠে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় উদয় খুব পর্যবেক্ষণ করে বললে, না রে স্টেশনই বটে, দেখছিস্ না, দু'একটা কাঁকর পড়ে রয়েছে। বাকি সব জলে ধুয়ে গেছে।

কাঁকর দেখে আশ্বস্ত হয়ে সামনে চাইলাম। বৃষ্টির ভিতর দূরে যেন একটা ভাঙা গাছ দেখা গেল। গাছ নয়, সেটা স্টেশনের নাম-লেখা সাইন-পোস্ট। বৃষ্টিতে নিচের মাটি আলগা হয়ে একটু হেলে পড়েছে। সাইন-পোস্টের পরে দূরে একটা ঘর এবং তার ভিতর একজন স্টেশনমাস্টার, টিকিট কালেক্টারকেও পাওয়া গেল। তাঁর হাতে রিটার্ন টিকিটের অর্ধেক দিয়ে রাস্তা জিগ্‌গেস করলাম। তিনি একটা কাটা খাল দেখিয়ে দিলেন মনে হলো। ওটা যে খাল মশাই, যাব কি করে নৌকা না-হলে? স্টেশনমাস্টার বুঝিয়ে দিলেন, খাল নয়, ওটাই রাস্তা, বৃষ্টিতে ওই অবস্থা হয়েছে। শুনলাম, সেই রাস্তায় সাঁতরে ও কাদা ঠেলে ক্রোশ-দুই এগুলে নসীপুর গ্রাম পাওয়া যাবে, যদি না বন্যায় সেটা ভেসে গিয়ে থাকে।

দলের অধিকাংশ লোক তৎক্ষণাৎ সেইখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু ভবেশ ছাড়বার পাত্র নয়। নগেন্দ্র 'মেমোরিয়াল শীল্ড'টা না নিয়ে যেন সে এখান থেকে বাড়ি ফিরবে না। কোন মতেই সকলকে বোঝাতে না পেরে সে চরম যুক্তি প্রয়োগ করলে। বাড়িতে ফিরবে কিন্তু যাবে কি হেঁটে? সত্যিই তো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রাত্তির আটটার আগে কোন ট্রেন এই মাঠে আর থামছে না। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে আমাদের ভবেশের কথাতেই রাজী হতে হলো।

নসীপুর কেমন করে পৌঁছলাম ও সেখানে জলে জলময় মাঠে ওয়াটার পোলো ও রাগবির মাঝামাঝি কি ধরনের খেলা হলো তার আর বর্ণনায় কাজ নেই। নসীপুর আগমনের এই ভূমিকাটুকু সেরে আসল কথায় এবার নামা যাক।

এগারো জন মিলে খেলতে এসেছিলাম। খেলা-ধূলায় নয়, খেলা-কাদার পর নসীপুর গ্রামের অবস্থা ও শীল্ডের কর্মকর্তাদের আতিথেয়তার নমুনা দেখে ছ'জন কিছুতেই আর থাকতে রাজী হলো না। বৃষ্টির ভেতর খাল বা রাস্তা সাঁতরেই তারা স্টেশনে ফিরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ও খেলায় কয়েকটি গোল খেয়ে আমরা একটু বেশী কাতর হয়ে পড়েছিলাম। এর পর বসন্তর আবাব একটু জ্বর-ভাবও দেখা দিয়েছে। জ্বর হওয়াটা আশ্চর্য নয়? কারণ ধাক্কাটা তার ওপর দিয়েই একটু বেশী গেছে। সে-ই ছিল গোলকীপার। জ্বর অবস্থায় বসন্তকে এই জলের ভেতর তো যেতে দেওয়া যায় না। বসন্তর সঙ্গে ভবেশ, আমি, উদয় ও সুরেন রাতটার মতো নসীপুরেই কাটিয়ে দেবো ঠিক করলাম।

ঠিক তো করলাম, কিন্তু থাকব কোথায়? 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শীল্ড'-এর কর্তা নগেনবাবু স্বয়ং আমাদের নিয়ে একটু ঘোরাফেরা করলেন। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল'-এর কর্তা স্বয়ং—শুনে একটু অবাক

হবেন অনেকে সন্দেহ হয়। আমরাও হয়েছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম, নগেনবাবু নিজের নামটা বেঁচে থাকতে থাকতেই স্মরণীয় করে রেখে যেতে চান। পরে কে কি করবে বলা তো যায় না! শীল্ড তৈরীর খরচ যখন তিনিই দিয়েছেন তখন মেমোরিয়ালটা দু'দিন আগে থাকতে হলে কার কি বলবার আছে? যাই হোক, নগেনবাবু আমাদের নিয়ে একটু-আধটু ঘোরাফেরা করেও সুবিধেমতো একটি থাকবার জায়গা খুঁজে পেলেন না। তাঁর নিজের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন আসায় স্থানাভাব। পাড়ার বাড়িতে আতিথেয়তার আদর্শ একটু নিচু বলেই মনে হলো। নসীপুরে আরও একটি পাড়া আছে, কিন্তু তাদের ওখানে শুনলাম, 'ব্রজমোহন কাপ' বলে আরও একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলা হয়। 'নগেন্দ্র মেমোরিয়াল' এর সঙ্গে তাদের আদা আর কাঁচকলার মত মধুর সম্পর্ক। এখানকার খেলুড়েদের তারা স্থান কিছুতেই দেবে না।

আশ্রয় পাওয়া সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, এমন সময় উদয়ের বুদ্ধিতে একটি সুরাহা হয়ে গেল। গ্রামের একটি মাত্র চলনসই রাস্তায় বার কয়েক আসা-যাওয়া করতে গিয়ে একটি মাত্র পাকা দোতলা বাড়ি সকলেরই চোখে পড়েছে। একটু ভগ্নদশা। কিন্তু আমাদের দশা তো তার চেয়েও খারাপ।

উদয় হঠাৎ বলে ফেলে,—এ বাড়িটির খোঁজ তো করেননি মশাই! ওদেরও একটা শীল্ড বা কাপ আছে নাকি?

নগেনবাবু হন-হন করে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন,—না-না মশাই, ও-বাড়ির দিকে তাকাবেন না।

তাঁকে একরকম জোর করে থামিয়ে বললাম,—কেন মশাই,কিসের দোষটা? একজন বিদেশী লোক জ্বরে পড়েছে শুনলেও এই বৃষ্টি-বাদলের রাতে আশ্রয় দেবে না—এমন চামার কেউ আছে নাকি?

নগেনবাবু একটু রেগেই বললেন,—আরে না মশাই! 'গ্রেট

বেঙ্গল স্পোর্টিং' বারো গোল খেয়েছিল তাদেরই ওখানে থাকতে দিইনি, আপনারা তো মোটে আট গোল।

সামান্য চারটে গোলের তফাতের দরুন এমন আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হতে হবে এ বড় অন্যায় কথা। সুরেন একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বললে,—একটু চেষ্টা করলে আর চারটে গোল কি আমরাও খেতে পারতুম না?

আরে না মশাই, সে-কথা নয়। চলুন চলুন।

কিন্তু আমরা অমন বাড়ির লোভ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নই কিছুতেই। একবার জিগ্‌গেস করলে দোষ কি, এই আমাদের বক্তব্য।

নগেনবাবু চটে বললেন,—কাকে জিগগেস করবেন মশাই? ও-বাড়িতে কেউ থাকে?

থাকে না? তাহলে তো আরো ভালো। একটা দরজা খোলা পেলেই হবে। নেহাত তালা ভাঙতেই হয় তো দামটা না-হয় দিয়েই দেবো।

নগেনবাবু আমাদের বিমূঢ় করে বললেন,—তালা নেই মশাই, দরজা সব খোলা।

দরজা খোলা, বাড়িতে কেউ নেই, তবু এই বৃষ্টির ভেতরে আমাদের ঘুরিয়ে মারছেন?

ঘুরিয়ে মারছি না আপনাদের, মারবার ইচ্ছে নেই বলেই তো ঘোরাচ্ছি।

উদয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের চেয়ে একটু চট করে খোলে। সে-ই প্রথম ব্যাপারটা আন্দাজ করে বললে—ভূতুড়ে বাড়ি নাকি মশাই?

নগেনবাবু মুখে কিছু না বলে শুধু একটু শিউরে উঠলেন।

ভবেশ হেসে বলেল,—এতক্ষণ বলতে হয়। ভূত পেলে কি এদেশে মানুষের আশ্রয় খুঁজি?

নগেনবাবু গম্ভীর হয়ে উঠলেন অত্যন্ত,—ও-বাড়িতে থাকা হাসির কথা নয় মশাই।

আমি বললাম,—বাড়ির বাইরে থাকাও বিশেষ হাসির ব্যাপার

মনে হচ্ছে না। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমরা ওখানেই চললাম। শুধু একটা হ্যারিকেন, ক'টা মাদুর ও একজোড়া তাস যদি যোগাড় করে দিতে পারেন।

নগেনবাবু তার পরেও আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। অগত্যা অত্যন্ত হতাশ ও করুণভাবে আমাদের শেষ-বিদায় দিয়ে ভবেশকে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। এ ভুতুড়ে বাড়িতে রাত্তির বেলা জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে আসতেও তিনি নারাজ।

বসন্তকে চাদর-টাদর মুড়ি দিয়ে আমরা ভুতুড়ে বাড়ির দেউড়ির নিচে ভবেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঝুপ-ঝুপ করে সামনে বৃষ্টি পড়ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পাড়াগাঁয়ের পথে একটা আলোর রেখা দূরে থাক, একটা জোনাকিরও দেখা নেই। অনেকদিন বিনা-ব্যবহারে পড়ে থাকার দরুন বাড়িটা থেকে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ দেউড়ির তলাতেই পাচ্ছিলাম। গাঁয়ের লোক বাড়িটা দেখে যে ভয় পায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বাড়িটা একেবারে গ্রামের একধারে। ধারে-কাছে একটা বসতি নেই। দিনের বেলা বাড়ির যা চেহারা দেখে গেছি, তা একটু অদ্ভুত। দোতলার একদিকে ঘরের জন্যে দেওয়াল তোলার পর ছাদ আর সম্পূর্ণ হয়নি। ছাদহীন দেওয়ালগুলো দরজা-জানালার শূন্য ফোকর নিয়ে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে বাড়িটার চেহারা সত্যিই কেমন যেন বদলে গেছে। বৃষ্টিতে অন্ধকারে বাড়িটাকে এখন অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু কেমন একটা চাপা অস্বস্তির আবহাওয়া টের পাচ্ছিলাম। ভবেশ একটা চাকরের মাথায় কিছু বিছানা চাপিয়ে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে খানিক বাদে এসে হাজির সত্যি খুশীই হলাম। চাকরটা আমাদের জিনিসপত্র দেউড়ির কাছে নামিয়ে দিয়েই যেভাবে পড়ি-কি-মরি করে দৌড় দিল তা একটা দেখবার জিনিস।

নিজেরাই বিছানাপত্র ও লণ্ঠন নিয়ে এবার ভেতরের ভাঙা সিঁড়ি

দিয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলার একদিকে গুটি-কয়েক ঘর ঠিক আছে। সিঁড়ির সামনের প্রথম ঘরটিই বেশ বড়।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটা তুলে ধরে ভবেশ অদ্ভুত সুর করে বললে,—কই বাপু ভূত, অতিথি-সজ্জন এল. একটু সাড়া দাও।

আমরা সকলে তার কথার সুরে শুধু নয়, সঙ্গে-সঙ্গে আরও কটা ব্যাপারেও হেসে উঠলাম। ভবেশের কথা শেষ হতে না হতেই ওধারের কোন ঘর থেকে লম্বা টানা কঁা—চ করে একটা শব্দ হলো। ভাঙা পুরানো কোন জানালার পাল্লা বাতাসে নড়ার শব্দ নিশ্চয়ই.তবু শব্দটা ঠিক জুতসই ও যথাসময়ে বলতে হবে।

ভবেশ হেসে বললে,—বেশ বেশ, এই তো ভদ্রতা। নসীপুর গ্রামে মানুষের চেয়ে ভূত ভালো।

সঙ্গে-সঙ্গে তার কথা সমর্থন করবার জন্যেই যেন পাশের ঘরে ঘড় ঘড় ঝন-ঝন করে একটা আওয়াজ হলো। একটু চমকে উঠলেও সবাই আবার হেসে ফেললাম। শুধু বসন্ত জ্বরের রুগী বলেই বোধ হয় একটু অপ্রসন্নভাবে বললে,—ঠাট্টা-তামাসা আর ভালো লাগছে না বাপু। বিছানা-টিছানা একটা করতে হয়তো করো।

সুরেন ও উদয়কে বিছানা পাতবার ভার দিয়ে আমি ও ভবেশ একবার পাশের ঘরে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা কি।

ভবেশ বললে,— সাড়া-টাড়া দিচ্ছেন যখন, সশরীরে একবার দেখা দেয় কি না দেখাই যাক না।

পাশের ঘরটা আকারে ছোট। দেয়াল থেকে নোনা-ধরা-চুন-বালি খসে পড়ে ও পুরনো কাঠ-কাটরার ভগ্নাংশ থাকার দরুন অত্যন্ত নোংরা। ঘরে ঢুকেই দু'জনে অমন চমকে উঠব ভাবিনি।

বাতিটা ছিল ভবেশের হাতে পেছনে। দরজার গোড়ায় পা দিতে-না-দিতেই অন্ধকারে কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলার মতো ফ্যাঁস করে একটা আওয়াজ শুনে সত্যি শিউরে উঠলাম নিজের অনিচ্ছায়। পেছন থেকে ভবেশও সেটা শুনতে পেয়েছিল, বাতিটা নিয়ে এগিয়ে

এসে বললে,—শুধু তোমার বাণী নয় বন্ধু, একটু দর্শনও দেও না। কই তিনি?

এবার তাঁকে দেখা গেল চাক্ষুষ। দেখে ভয় পাবারই কথা! অত বড় এবং অমন মিশকালো বেড়াল বাংলা-মুল্লুকে জন্মায় বলে জানা ছিল না। তিনি তাঁর বহুদিনের দখলী-স্বত্বের ওপর আমাদের চড়াও হওয়াটা অন্যায় উপদ্রব মনে করে জ্বলজ্বলে চোখে গায়ের লোম ফুলিয়ে তখন দন্তবিকাশ করছিলেন।

ভবেশ বাতিটা নামিয়ে হতাশার ভঙ্গিতে বললে,—এটা কি ভালো হলো প্রভু? এত আশ্বাস দিয়ে শেষকালে বেড়াল রূপ ধারণ করলেন। আপনার নিজমূর্তি কই?

বেড়ালটা আর একবার ফ্যাঁস করে উঠল উত্তরে, আমরা হেসে ফেললাম। পেছনের ঘর থেকে বসন্তর বিরক্ত-গলা শোনা গেল,—আবার বাতিটা নিয়ে গেলি কোথায়—অন্ধকারেই থাকব নাকি?

সে-ঘরে ফিরে ভবেশ হেসে বললে,—তোর কি ভয় করছে নাকি? না, জ্বরের লক্ষণ?

বসন্ত আরো যেন বিরক্ত হয়ে বললে,—ভয়-টয় জানি না বাপু। আমার ভালো লাগছে না। খুজে খুঁজে আচ্ছা থাকবার জায়গা বার করেছ।

আমরা সবাই মিলে তাকে অবশ্য ঠাট্টায় নাকাল করে তুললাম, কিন্তু তা সত্বেও মনে হচ্ছিল, অস্বস্তি একা বসন্তরই হয়নি।

সামনে দীর্ঘ রাত। খাবার-দাবার নগেনবাবু চাকরের সঙ্গে যা পাঠিয়েছিলেন, তার সৎকার করে বসন্তকে একটা বিছানায় শুতে বলে আমরা আর একটায় তাস খেলতে বসলাম। কেন বলা যায় না,সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে ও ফুটবল খেলে ক্লান্ত হলেও ঘুমোবার জন্যে শুতে কেউ ব্যাকুল নয় দেখা গেল।

তাস খেলা কিছুতেই জমল না। এক সময় সবাই তাস ফেলে

দিলাম। সুরেন বললে,—এবার শুয়ে পড়লে হয়। আমরা সবাই সায় দিলাম, কিন্তু কারুর ওঠবার নাম নেই।

হঠাৎ ভবেশ বললে,—সাধারণ লোক কেন ভয় পায় বুঝেছ তো! কি রকম আওয়াজটা হচ্ছে শুনেছ? কে বলবে যে ও-ঘরে একটা কাঠের পা ঠকঠকিয়ে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে না?

আওয়াজটা আমরা সবাই শুনেছিলাম, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলিনি।

ভবেশ আবার বললে,—এসব থেকেই মানুষ ভূত তৈরি করে।

ভবেশের কথা শেষ না হতেই উদয় বললে,—তা না হয় হলো কিন্তু অমন আওয়াজটাই বা কিসের, ও তো আর জানালা নড়ার শব্দ নয়।

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম একবার। সকলেই একটু যেন হতভম্ব। হঠাৎ সুরেন লণ্ঠনটা নিয়ে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠে পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। কই, কোথাও কিছু নেই তো!

ভবেশ হেসে উঠল,—আমাদেরও ভয় ধরল নাকি? তার হাসিটা খুব আন্তরিক শোনাল না।

উদয় হঠাৎ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—কিন্তু ওটা কি?

আমাদের সকলের দৃষ্টি তখন সেদিকে পড়েছে। আমি গিয়ে সেটা হাত দিয়ে তুলে ধরলাম,—একটা কালো রঙের খানিকটা ছেঁড়া কাপড়।

হেসে বললাম,—রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে নাকি?

এবারে ভবেশই বললে,—কিন্তু বেড়ালটা কোথায় গেল? ওই-খানেই দেখেছিলাম না?

তাও তো ঠিক? বেড়ালটাকে তো এইখানেই দেখা গেছল। এই কাপড়কে ভুল করে কি—না, তাও সম্ভব নয়, স্পষ্ট তাকে দেখেছি, রাগের ফোঁসফোঁসানি শুনেছি নিজের কানে।

তবু একটু হেসে বললাম,—বেড়ালটা কি তোমার জন্য এতক্ষণ বসে আছে ? সে কখন সরে পড়েছে।

কিন্তু কোথা দিয়ে ? এ-ঘরের একটি মাত্র জানালা, তাও বন্ধ। ওধারের দরজায় খিল দেওয়া তো দেখতেই পাচ্ছ।

বললাম,—আমাদেরঘর দিয়েই পালিয়েছে হয়তো। মুখে বললেও মনের খটকা গেল না। আমাদের ঘর দিয়ে কোন বেড়ালের পক্ষে আমাদের অজান্তে যাওয়া সম্ভব তো নয়। একেবারে দরজার সামনেই আমরা তাসের আসর পেতে বসেছিলাম। একটা ধুমসো মিশকালো বেড়াল পেরিয়ে গেলে জানতে পারব না, এমন বেহুঁশ আমরা ছিলাম কি ?

ভবেশ বললে,—থাকগে, বেড়ালের অন্তর্ধান-তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে—আর—

তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। আমাদের সকলের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বরফ-গলানো জলের স্রোত নেমে গেল বিদ্যুদ্বেগে।

ওধারের ঘরে বসন্তর সে কি আতঙ্কের চিৎকার। উত্তেজনার মুখে আমরা সবাই তাকে অন্ধকারে একলা ফেলে এসেছি।

ছুটে সবাই ঐ ঘরে এলাম। বসন্ত ছাই-এর মত মুখ করে উঠে বসেছে। তার কপাল-মুখ অসম্ভব রকম ঘেমে উঠেছে।

হয়েছে কি ? কি হলো ?

বসন্ত হাঁপাবে না কথা বলবে! অনেক কষ্টে থেমে-থেমে যা বললে তার মর্ম—তার মাথার কাছে বসে কে যেন বরফের মত ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস তার মুখে ফেলেছিল। আমরা সবাই হেসে উঠলাম জোর করে,—ঘুমের ঘোরে তুই দুঃস্বপ্ন দেখেছিস।

বসন্ত তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বললে,—না-না, আমি জেগে স্পষ্ট সে নিঃশ্বাস শুনেছি, মুখের ওপর টের পেয়েছি অনেকক্ষণ, তারপর চিৎকার করেছি। তোরা ও-রকম করে চলে যাসনি।

ভবেশ হাসবার চেষ্টা করে বললে—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।

এমন ভয়কাতুরে ছেলেও দেখিনি। আমরা এখানেই শুচ্ছি এবার।

উদয় একটু ইতস্ততঃ করে বললে,—এক্ষুণি শুয়ে কি দরকার? জেগে একটু গল্প করা যাক না।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লেও কারুর সে কথায় আপত্তি দেখা গেল না, ভবেশেরও না।

বেশ তো। ভবেশ বললে,—কিসের গল্প হবে? বল সুরেন, একটা ভূতের গল্পই বল, এ-বাড়িতে বেশ লাগবে।

বসন্ত তাড়াতাড়ি বললে,—না-না।

যাঃ, তুই একেবারে ভীতুর এক শেষ। বল সুরেন।

সুরেন ম্লানভাবে একটু হেসে বললে,—বলবো তাহলে? শোন। 'আনবীট্ ইলেভ্ন' বলে এক টীম গেছল নন্দীপুরে—

আমরা সবাই একটু হাসলাম। ভবেশ বললে,—আহা, বলতেই দাও ওকে।

সুরেন বলতে শুরু করলে,—আমাদের নন্দীপুরে আসা ও তার পরের ঘটনার যে বর্ণনা দিলে, তাতে অন্য সময় হলে হাসি আসতো নিশ্চয়, কিন্তু ঘরে এখন সাড়া-শব্দ বিশেষ নেই। গল্প-শেষে ভূতুড়ে বাড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছল। সেখানকার ঘটনাগুলো একে একে শেষ করে সুরেন বললে,—ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, বাইরে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত শব্দ আরো নানারকম বিদঘুটে আওয়াজ। ঘরে লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় একজন গল্প বলছে, ভূতের গল্প! কেউ সে গল্প বিশ্বাস করে না, গল্প যে বলছে সে হঠাৎ একটা তাস নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বললে,—অশরীরী কেউ এখানে থাক তো এ তাস বাতাসে মিলিয়ে যাক।

হাসতে গিয়ে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

উদয় বললে,—আরে, তাসটা পড়ল কোথায়? সুরেন সত্যি-সত্যিই গল্পের সঙ্গে একটা তাস ছুঁড়েছিল।

ভবেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বলবার চেষ্টা করলে,—পড়েবে কোথাও ওদিকে।

কোথায়? উদয়ের গলায় স্বর তীক্ষ্ণ—ওদিকে তো খালি মেঝে। এ-ঘরে জিনিস লুকিয়ে থাকবার মতো জায়গা নেই।

আমি তবু উঠে বসন্তর বিছানার আশপাশে সমস্ত ভালো করে খুঁজলাম। অন্য সবাইও তন্ন-তন্ন করে সমস্ত ঘর খুঁজে দেখল।

আশ্চর্য! আমাদের সকলের মুখ গম্ভীর। শুধু বসন্ত নয় আমাদের কপালে ও ঘাম দেখা দিয়েছে।

ভবেশ হঠাৎ আকারণে অত্যন্ত হেসে উঠে বললে—কি তোমরা যা-তা করছ? পাগল হলে নাকি সবাই? নাও সুরেন, গল্প বলো।

শুকনো পাংশু-মুখে আমরা যন্ত্র-চালিতের মতো আবার এসে বসলাম। সুরেনের মুখে যেন রক্ত নেই। সকলের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার একটা তাস তুলে নিলে, তারপর বললে,—আগের তাসটা উড়ে গেল—

ভবেশ শুধু বললে,—হুঁ।

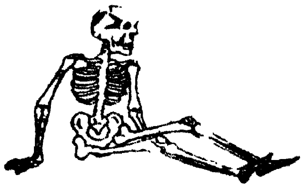
আবার একটা তাস নিয়ে গল্পের কথক বললে,—উড়ে যাওয়টা প্রমাণ নয়। সুরেনের স্বর অত্যন্ত অস্ফুট—এবার তাস থেকে একটা মস্ত কালো বেড়াল বেরিয়ে—

বসন্তর চিৎকার সকলের ওপরে শোনা গেল। তার বিছানার ঠিক পায়ের কাছে—

না, সে-বার অক্ষত দেহেই তার পরের দিন কলকাতায় ফিরছিলাম। শুধু বসন্তর জ্বরটা বিকারে দাঁড়িয়েছিল কলকাতায় এসে। বেচারাকে ভুগতে হয়েছিল অনেক দিন।

রাতবিরেতে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ



মুরারীবাবু খুব বিপদে পড়েছেন। রাতদুপুরে বাড়ির উঠোনে টুপটাপ করে ঢিল পড়ে। কারা ছাদে হেঁটে বেড়ায় ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ। বেরিয়ে কিন্তু কাউকেও দেখতে পান না। টর্চ জ্বেলে বাড়ির চারপাশটা বৃথা খোঁজাখুঁজি করেন। নিরিবিলি জায়গায় বাড়িটা। পাড়ার মধ্যেও নয় যে ছেলেরা দুষ্টুমি করবে। তাছাড়া তাজ্জব ব্যাপার, ঢিল পড়ার শব্দ হয় এবং তাঁর টাকেও পড়ে, অথচ ঢিল দেখতে পান না।

তাহলে ? এ নিশ্চয় অশারীরীদের কাজ। মুরারীবাবুর বন্ধু ফৈজুদ্দিন এ শহরের নামকরা উকিল। তিনি এসে সব শুনে বললেন, "দেখ মুরারি ? আমার মনে হচ্ছে, তুমি জিনের পাল্লায় পড়েছ।"

মুরারীবাবু বললেন, "জিন ? সে আবার কী ? সবাই তো বলছে এ ভূতেরই কাণ্ড।"

"উহু। ভূত থাকে বনবাদাড়ে, জলার ধারে। নিরিবিলি জায়গায়। পারতপক্ষে তারা মানুষের কাছে ঘেঁষে না। কারণ, মানুষ মরেই তো ভূত হয়। বেঁচে থাকার ঝক্কি কতটা, মানুষ মরার আগে হাড়ে-হাড়ে জেনে যায়! ঘেন্না ধরে যায় মনুষ্যজীবনে। কাজেই মরে ভূত হওয়ার পর কোন পাগল আর মানুষ্যজীবনের আনাচে-কানাচে আসতে চাইবে বলো।"

মুরারীবাবুর মনে ধরল কথাটা। ফৈজুদ্দিন উকিলের যুক্তির

প্যাঁচে কত বাঘা-বাঘা হাকিম হার মানেন। মুরারীবাবু বললেন, "হুঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু জিন কী?"

ফৈজুদ্দিন খুশি হয়ে বললেন, "জিনদের ব্যাপার-স্যাপার অবিকল ভুতদেরই মতো। তবে তারা একরকম প্রাণী বলতে পারো। তারা মানুষের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। এঁটো কাঁটা, আবর্জনা, গোবর, হাড় এইসব নোংরা জিনিস তাদের খাদ্য। ইচ্ছে করলেই তারা অদৃশ্য হতে পারে। আবার ইচ্ছে করলেই নানারকম রূপ ধরতেও পারে।

"তারা থাকে কোথায়?"

"পোড়ো বাড়িতে। চিলেকোঠায়। ছাদে। কখনও বাথরুমের ঘুলঘুলিতে।" ফৈজুদ্দিন চাপা গলায় বললেন। "আমার বাথরুমের ঘুলঘুলিতে একটা জিন ছিল। বুঝলে? রোজ চান করতে ঢুকতুম আর বেটা মুখ বাড়িয়ে আমায় ভেংচি কাটত। দুটো জ্বলজ্বলে নীল চোখ। বাপ্‌স্। এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।"

মুরারী আঁতকে উঠে বললেন "দেখতে কেমন জিনটা? খুব ভয়ঙ্কর চেহারা নিশ্চয়?"

"তত কিছু না।" ফৈজুদ্দিন কড়ে আঙুল দেখালেন, এইটুকুন। একটা টিকটিকির মতো খিদঘুটে।

"তারপর? তারপর? কীভাবে সেটা তাড়ালে?"

'কালো ফকিরকে ডেকে আনলাম। সে ব্যাটাকে আতরের শিশিতে পুরে পুকুরে ফেলে দিয়ে এল। তুমি কালা ফকিরের কেরামতি তো জানো না? তাকে দেখলে জিনেরা লেজ ফেলে-রেখে পালায়।"

মুরারীর একটু খটকা লাগল। বললেন, 'পালায় যদি, শিশিতে পোরে কীভাবে?"

ফৈজুদ্দিন ফ্যাচ করে হাসলেন। 'সেটাই তো কালা ফকিরের কেরামতি। তুমি এক্ষুণি ওর কাছে যাও। দেখবে ফকির সাহেব

এসে তোমার বাড়ির জিনগুলোকে বস্তায় পুরে সমুদ্দুরে ফেলে দিয়ে আসবে।"

মুরারী লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু ফের খটকা লাগল মনে। বললেন, "বস্তা কেন? এই যে বললে আতরের শিশির কথা?"

"বুঝলে না? তোমার বাড়ির জিন তো ঘুলঘুলির খুদে জিন নয়। একটা-দুটোও নয়—একেবারে এক ঝাঁক। তাছাড়া তারা ভেংচি কাটে না, ঢিল ছোঁড়ে; ছাদ কাঁপিয়ে হেঁটে বেড়ায়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, তাদের সাইজ বড়। যাক্ গে, আমার আদালতে যাওয়ার সময় হল। তুমি এক্ষুণি কালা ফকিরের কাছে যাও।"

ফৈজুদ্দিন ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। একটু পরে মুরারীবাবুও বেরিয়ে পড়লেন। কালা ফকির থাকে শহরের বাইরে এক নির্জন জায়গায়। নিঝুম জায়গা। কোনো পীর সায়েবের কবর আছে। ফকির সেই কবরে আগরবাতি জ্বালে। কদাচিৎ ভক্তরা এসে সিন্নি আর দশ-বিশ পয়সা মানত দিয়ে যায়।

মুরারীবাবুকে দেখেই কালা ফকির চোখ পাকিয়ে বলল, "কী? জিনের পাল্লায় পড়েছ বুঝি? ভাগো, এখন আমার যাবার সময় নেই।"—আলখেল্লাপরা পাগলাটে ধরনের ফকিরকে দেখে মুরারীবাবু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তার ওপর এই ধমক। কিন্তু উপায় নেই। খুব ভক্তি দেখিয়ে একটা টাকা ফকিরের পায়ের কাছে রেখে বিনীতভাবে বললেন, "দয়া করে একবার যেতেই হবে বাবা। রাতে ওদের অত্যাচারে ঘুম হয় না। বড্ড বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে।"

ফকির টাকাটা ভাল করে দেখে নিয়ে আলখেল্লার ভেতরে চালান করে দিল। তারপর বলল, "ঠিক আছে। বাড়ি গিয়ে একটা বস্তা যোগাড় রাখো। সব নিশুতি হলে রেতের বেলা যাব'খন।"

কালা ফকির সন্ধ্যা গড়িয়ে একটু রাত করে এল। বস্তাটা ভাল করে দেখে নিল ফুটো আছে নাকি। তারপর সেটা নিয়ে একটা

অষ্টচক্র লাঠি নাচাতে নাচতে সে অন্ধকারে বাড়ির চারদিকে চক্কর দিতে থাকল। বিড় বিড় করে কি সব আওড়াচ্ছিল ও। এদিকে মুরারীবাবু, তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সে ঘরের ভেতরে থাকতে বলেছে। খবর্দার, কেউ যেন না বেরোয়। বেরুলে বিপদ।

কতক্ষণ পরে ফকির চেঁচিয়ে ডাকল, "বেরিয়ে এস সব। কেল্লা ফতে। সবকো পাকাড় লিয়া।"

সবাই বেরিয়ে গিয়ে দেখল, কালা ফকির বস্তার মুখটা দড়ি দিয়ে বেঁধে তার ওপর সেই বাঁকাচোরা লাঠিটা দমাদম চালাচ্ছে। "বল। আর জ্বালাবি ? বল কখনো ঢিল ছুঁড়বি ?"

মুরারীবাবু স্ত্রী নরম মনের মানুষ। কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন, "ওগো ফকিরসায়েবকে বারণ করো। আহা, অত করে বেচারাদের মারে না যেন। মরে যাবে।"

ফকির একগাল হেসে বলল, "ঠিক আছে। মা-ঠাকরুণ বলছে যখন। তো কই রাহাখরচ দাও। সমুদ্দরে ফেলতে যাব। সমুদ্দর কি এখানে ? তের নদীর পারে। ট্রেনে বাসে জাহাজে কতবার চাপতে হবে, তবে না।"

রাহাখরচ নিয়ে ফকির চলে গেল। বস্তা কাঁধে নিয়েই গেল। মুরারীবাবুর মেয়ে বিলু চোখ বড় করে বলল, "বাবা, বাবা! বস্তার ভেতর কেমন একটা শব্দ হচ্ছিল শুনেছ ?"

তার মা বললেন, "চুপ, চুপ। বলতে নেই।"

আজ সবাই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে আরও রাত হল। বাড়ি নিরাপদ। তাই উঠোনে মুরারীবাবু মহানন্দে পায়চারি করতে থাকলেন। গল্প-গুজবও করলেন নানারকম। সব নিশুতি নিঝুম হয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। জোনাকি জ্বলছে গাছপালায়। সেই সময় বারোটা পাঁচের ডাউন ট্রেন শিস দিতে দিতে আসছে। রেল লাইন বাড়ির ওপাশ দিয়ে গেছে। বাড়ি থেকে উঁচুতে রেললাইনটা। ট্রেন গেলে উঠোন থেকেও দেখা যায়। ট্রেনের

আলো ঝলসে দিয়ে যায় বাড়িটাকে। বিলুর ভাই অমু বলল, "বাবা, ফকির এই ট্রেনেই যাচ্ছে।"

মুরারীবাবু বললেন, হ্যাঁ। "বে অফ বেঙ্গল যেতে হলে—"

হঠাৎ তার কথা থেমে গেল। লাফিয়ে উঠলেন তিনি। এ কী! ফের তাঁর মাথায় ঢিল পড়ল যে? শুধু তাই নয়, কালো-কালো আরও ঢিল উঠোনে তাঁর আশেপাশে টুপটুপ করে পড়ছে। ট্রেনের আলোটা সোজা এসে পড়েছে তাঁর গায়ে। মুরারীবাবু আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। মুখে কথা নেই! ট্রেন চলে গেলে ঝলসানো আলোটাও সরলো। তখন মুরারীর মুখে কথা এল।—"ঘরে ঢোকো! ঘরে ঢোকো!" বলে উঠোন থেকে বারান্দায় উঠলেন।

তারপর রাগে দুঃখে আতঙ্কে অস্থির হয়ে বললেন, "ব্যাটা ভণ্ড ফকির স্রেফ ঠকিয়ে গেল! ওঃ কী ভুল না করেছি!"

বিলুর মা বললেন, "সে কি! কেন, কেন ও-কথা বলছ?"

"এইমাত্র ঢিল পড়ল দেখলে না! আমার মাথাতেও পড়ল! মুরারী টাকে হাত বুলোতে গিয়ে ফের লাফিয়ে উঠলেন। ওরে বাবা! আমার কানের পাশে কী যেন রয়েছে! ঢিল! ভুতুড়ে ঢিল আটকে রয়েছে।"

অমু বাবার কানের পাশে থেকে কালো কী একটা খপ করে ধরে ফেলল। তারপর বলল, "ও বাবা! এটা তো চামচিকে!"

"অ্যাঁ! মুরারী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। অমু চামচিকেটা ছেড়ে দিতেই থামের গায়ে আটকে গেল! কিন্তু বলা যায় না, জিনেরা কতরকম রূপ ধরে! তাই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "মার্, মার্। জুতোপেটা কর্।"

সেই সময় অমু বলে উঠল, "বাবা, ইউরেকা!"

"ইউরেকা মানে?"

অমু রহস্যভেদী গোয়েন্দার মতো ভারিক্কি চালে বলল, মাত্র চামচিকে। স্রেফ চামচিকে বাবা! বুঝলে না? ট্রেনের আলো

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উড়ন্ত চামচিকেগুলোর চোখ ধাঁধিয়ে যায় আর টুপটুপ করে পড়তে থাকে! আমরা ভাবি ঢিল পড়ছে!"

মুরারীবাবু সন্দিগ্ধভাবে বললেন, "কিন্তু ছাদের ধুপধুপ শব্দ?"

অমু তেমনি গম্ভীর হয়ে বলল, "শব্দ হোক না। আমি ছাদে যাব!"

তার মা বললেন, "ওরে না, না! যাসনে অমু। ওই শোন, কারা হেঁটে বেড়াচ্ছে! ওগো, কাল বরং ওঝা ডেকে আনো! মনে হচ্ছে, ওরা জিনটিন নয়, অন্য কিছু।"

মুরারী সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। ভূতই বটে। কালই হরিপদ ওঝার বাড়ি যাব।"

ওদিকে তক্ষুণি অমু ছাদে চলে গেছে টর্চ নিয়ে। ছাদ থেকে তার গলা শোনা গেল! "বাবা। মা। ইউরেকা, এগেন ইউরেকা।"

এঁরা সবাই উঠোনে নামলেন ভয়ে-ভয়ে। কী দস্যি ছেলেরে বাবা! মুরারী বললেন, "কী রে।"

"ছুঁচো বাবা।"

"অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ বাবা! আর কিছু না—স্রেফ ছুঁচো। দেখবে এসো!"

মুরারী নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হুঁ। নেমে আয়।"

ছাদে রাজ্যের আবর্জনা জমে আছে। পুরনো বাড়ি। ছুঁচোর আড্ডা হতেই পারে। রাতবিরেতে একদঙ্গল ছুঁচো ছাদে ডন টানে। কেত্তনও গায় নেচে-নেচে। তাই শব্দ হয়। বাড়িটা এবার মেরামত করে কলি ফেরানো দরকার। চামচিকে, ছুঁচো, ইঁদুর, আরশোলা টিকটিকির আড্ডা হয়ে গেছে।

গঙ্গাধরের বিপদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



অনেকদিন আগেকার কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে। সে সময় মসলা-পোস্তায় গঙ্গাধর কুণ্ডুর ছোটখাটো একখানা মসলার দোকান ছিল।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলী জেলা চাঁপাডাঙার কাছে। অনেকদিনের দোকান, যে সময়ের কথা বলচি, গঙ্গাধরের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভালো যাচ্ছিল না। নানারকম অসুখে ভুগতো প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়েছিল। দোকানঘরের ভাড়া দু' মাসের বাকি, মহাজনের দেনা ঘাড়ে—দুপুরবেলা দোকানে বসে থেলো হুঁকো হাতে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল আজ আবার সন্ধ্যার সময় গোমস্তা আসবে ভাড়া নিতে বলে শাসিয়ে গিয়েছে! কি বলা যায় তাকে।

এক পুরানো পরিচিত মহাজনের কথা তার মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পোশোয়ারী মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েছে শোধও করেছে—কিন্তু সুদের হার বড় বেশী বলে ইদানীং বছর কয়েক সেদিকে যায়নি!

ভেবেচিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হলো। সুদ বেশী বলে আর উপায় কি? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধ্যার মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে

টাকা নিতে, গল্পগুজব করতে দেরি হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হন-হন করে হেঁটে আসছে,—এমন সময়ে একজন লোক তাকে ডেকে বললে,—এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জেরা—

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলে সেখানে কতকগুলো গাছপালায় বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জন, তার ওপর আবার তার সঙ্গে রয়েছে টাকা। গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হলো এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই, লোকটা এগিয়ে এল। ওই গাছগুলোর তলায় সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের ওপর পড়েছে, মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। পরনে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে স্বর নীচু করে হিন্দীতে ও ভাঙা বাংলায় মিলিয়ে বলল,—বাবু, সস্তায় মাল কিনবেন?

গঙ্গাধর আশ্চর্য হয়ে বললে, কি মাল?

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বললে, এখানে হবে না বাবু, পুলিশ ঘুরচে আমার সঙ্গে আসুন।

ঝুপসি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বললে, জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট মাল—লুকিয়ে দেবো।

গঙ্গাধর চমকে উঠল।

সে কখনো ও ব্যবসা করেনি। ডিউটি-ছুট কোকেন—কী সর্বনেশে জিনিস! ভালো লোকের পাল্লায় পড়ছে। না—সে কিনবে না।

লোকটা সম্ভবতঃ পাঞ্জাবী মুসলমান। বাংলা বলতে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। সে অনুনয়ের সুরে বলল,—বাবু, আপনি নিন। আপনার ভালো হবে। সিকি কড়িতে—দেবো—আমার

মুশকিল হয়েচে আমি মাল বিক্রির লোক খুঁজে পাচ্চিনে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় যেতে পারিনে, পুলিশের ভয় তো আছে! কেউ কথা কইচে না আমার সঙ্গে, সেই হয়েচে আরও মুশকিল। হঠাৎ শহরে এত পুলিশের ভয় হলো যে কেন বাবু তা বুঝিনে—আগে যারা এ ব্যবসা করতো, তাদের কাছে যাচ্চি। তারা আমার দিকে চেয়েও দেখচে না। আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন, পরে দামদস্তুর হবে।

লোকটার গলার সুরে একটা কি শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজল। কোকেনের ব্যবসাতে মানুষে রাতারাতি বড় মানুষ হয়েচে বটে! বিনা সাহসে, বিপদ এড়িয়ে চলে বেড়ালে কি লক্ষ্মীলাভ হয়? দেখাই যাক না।

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখলে লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়েছিল, কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে, এই ভয়ে বেশী জোরে ডাকতেও সাহস পেল না! চাপা গলায় বাঙালী হিন্দিতে ডাকলে—কোথায় গিয়া ও খাঁ সাহেব? এদিকে-ওদিকে চাওয়ার পর সামনে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁ সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গঙ্গাধর বললে,—জলদি বলো, রাত হো গিয়া। অনেক দূর জানে হোগা।

কি একটা যেন ঢাকবার জন্য লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করচে। বললে,—আমার সঙ্গে এসো মাল দেখাবো।

দু'জনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেকদূর গেল। যে সময়ের কথা বলচি, তখন ওদিকে অত লোকজন ছিল না। মাঝে-মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড়-বড় নৌকা ডাঙায় কাদার ওপর পড়ে আছে, দু' একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে-দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদা কাঁটার বন, পেছনে অনেক দূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্চে।

পথে যেতে যেতে খাঁ সাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বললে,—আমায় দেখতে পাচ্চ তো?

কেন পাবো না? এমন বয়েস এখনও হয়নি যে এই সন্ধ্যেবেলাতেই চোখে ঠাওর হবে না।

একবার গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলে,—তোমার ডেরা কোথায় খাঁ সাহেব?

লোকটা চকিত পিছনে ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—কেন, সে তোমার কি দরকার? পুলিশে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাক যদি, তবে ভালো হবে না জেনো। মাল দেবো, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে—আমার বাসার খোঁজে তোমার কি কাজ?

লোকটার চোখের চাউনি কী অদ্ভুত! গঙ্গাধর অস্বস্তিবোধ করলে। মুখ ভালো দেখা যায় না—কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝলসে উঠল। না, সঙ্গে তার টাকা রয়েছে, এ অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাত-কুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধ্যেবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েছে। লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন এসেইচে তখন আর চারা নেই। বিশেষতঃ সে যে ভয় পেয়েচে এটা না দেখানই ভালো। দেখালে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বৈ কমবে না। ছুরি বার করে বসলে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেক দূরে গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটি গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে গুদামঘরের দরজা থেকে একটু দূরে। তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখলে, গুদামঘরের আশেপাশে সর্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হলেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়—সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হলো গুদামঘরটা পুরানো এবং যেন অনেক কাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। বাঁশের বেড়া খসে

পড়েচে, জায়গায়-জায়গায় চালের খোলা উড়ে গিয়েচে, দোরটা মাঝে-মাঝে উইধরা, ভেঙে পড়তে চাইচে যেন —

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হলো। কেন সে এখানে এল এই সন্ধ্যায় ? এরকম জায়গায় একা মানুষ আসে, বিশেষ করে এতগুলি টাকা সঙ্গে করে ? সে আসত না কখনই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙাল দেশ থেকে নতুন আসেনি। কিন্তু ওই লোকটার কথার সুরে কি যাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেচে, সাধ্য ছিল না যে সে ছাড়ায়। একথা এখন তার মনে হলো—

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁ সাহেবের মূর্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এমন নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরনের যেন মনে হয় অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল,আবার ফুটে বেরুল। কোথাও যে চলে গিয়েছিল এমন মনে হয় না। পাকা আর ঝুনো খেলোয়াড় আর কি !

খাঁ সাহেব দোর খুলে ঘরে ঢুকল। গঙ্গাধরকে ও যখন পেছনে পেছনে আসতে বলল তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিম ঝিম করছে, বুক ঢিপ ঢিপ করছে। এই অন্ধকার গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ওর লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে কিংবা বুকে ছুরি বসাবে—এই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেছে। লোকটা নিশ্চয়ই জানত যে তার কাছে টাকা আছে, সন্ধান রেখেছিল। কে জানে খোদাদাদ খাঁয়ের দলের লোক কিনা! গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিল। একবার সে ভাবলে দৌড়ে পালাবে ? কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

কলের পুতুলের মত গঙ্গাধর গুদামের মধ্যে ঢুকল ! আশ্চর্য ! গুদামের ওদিকের দেওয়ালটা যে একেবার ভাঙা ! গুদামের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে। এক জানগায় দুটো খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে, কিন্তু নাকে-মুখে লাগে। একটা কি রকম ভ্যাপসা গন্ধ

গুদামের মধ্যে, মেঝেটা স্যাঁৎসেতে, কতকাল এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকেনি।

এদিকে আবার খাঁ সাহেব কোথায় গেল! লোকটা থাকে-থাকে যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ—মিনিট দুই হবে—কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা—আবার সেই ভয়টা হলো। কেমন এক ধরণের ভয়—যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এই বা কি ধরনের ভয়? আর গুদামঘরটার মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইছে মাঝে মাঝে।

মিনিট দুই পরে খাঁ সাহেব—এই তো আধ-অন্ধকারের মধ্যে সামনেই দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ আবার একটা অদ্ভুত কথা বললে খাঁ সাহেব! বললে,—তুমি কালা না কি? এতক্ষণ কথা বলচি, শুনতে পাচ্ছ না? কথার উত্তর দিচ্চ না কেন?। কোকেন যে জায়গায় আছে বললাম—তা দেখতে পেয়েচ? শাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বললাম পিপে দুটো। হাঁ করে সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?

বা-রে! এত কথা কখন বলেছে লোকটা? পাগল নাকি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে, মূঢ়ের মত দৃষ্টিতে চেয়ে ও বললে—কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা—কই, কোথায় শাবল! কথা বলতে-বলতে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ খাঁ সাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো তার বিভ্রান্ত বিমূঢ় আতঙ্কাকুল দৃষ্টির সামনে খাঁ সাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত-পা, সারা দেহটা যেন চুর-চুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়ছে—সব যেন ভেঙে ভেঙে বাতাসে উড়ে-উড়ে যাচ্ছে—খাঁ সাহেব প্রাণপণে দাঁতমুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখবার জন্যে চেষ্টা করছে। কিন্তু পেরে উঠছে না। তার চোখের সে বিজিত হতাশ দৃষ্টি গঙ্গাধরের হৃদয় স্পর্শ করলে। দেখতে-দেখতে অত বড় দীর্ঘাকৃতি

দেহের আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না—সব ভেঙে গেল, উড়ে গেল—এক—দুই—তিন—চার।

আর কোথায় খাঁ সাহেব? চারপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিলিয়ে গিয়েচে—একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপটা এলো কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্তরবে চিৎকার করে গুদামঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

একটা দিশী ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পৌঁছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ছিল, কানাকড়িও খোয়া যায়নি। তবে শরীর শুধ্‌রে উঠতে সময় নিয়েছিল, অনেক দিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারত না।

মাস দুই পরে মেটেরুবুজের খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে গঙ্গাধর টাকা নিয়ে যাবার দিন কি ঘটেছিল সেটা বললে খোদাদদ গল্প শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললে,—শাহজী, ও হলো আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর পনেরো আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তক্তা-ঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল, সেখান থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলে, জাহাজের লোকের সঙ্গে সাট ছিল। কোথায় সে মাল রাখত কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি সে হঠাৎ খুন হয়। কেন বা কে খুন করলে জানা যায়নি, কেউ ধরাও পড়েনি। তবে দলের লোকেই তাকে খুন করেছিল, এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি! আমার মনে হয়, আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্চে তার মাল বিক্রি করবার জন্যে, ওর লুকানো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা। তা বাবু, গুদামঘরটা কোথায় তুমি দেখাতে পারবে?

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেত না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়ল, পুরানো ভাঙা গুদামঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা। হতভাগা কি এতদিনেও বোঝেনি সে মারা গিয়েছে?—কে উত্তর দেবে? ভগবান তার আত্মাকে শান্তি দিন!

আকস্মিক

নীহাররঞ্জন গুপ্ত



কথা হচ্ছিল আমাদের এক বন্ধু বিভূতিকে নিয়েই।

প্রায় দশ-বার দিন আমাদের আড্ডায় সে অনুপস্থিত। কোন খবর পর্যন্ত নেই। অথচ দলের মধ্যে সে-ই বেশী আড্ডাবাজ।

রোজকার মত আমরা আমাদের ক্লাব-ঘরে এসে সেদিন সন্ধ্যায়ও জমায়েত হয়েছি এবং কখন যে আকাশ ভেঙে মুসলধারায় বৃষ্টি নেমেছে টেরও পাইনি। খেয়াল হলো রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ। এবারে বাড়ি ফেরা দরকার; কিন্তু দরজা খুলতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে করে সঙ্গে সঙ্গে আবার দরজাটা তক্ষুণি বন্ধ করে দিতে হলো।

ঝম্ ঝম্ করে তখনও সমানে বৃষ্টি ঝরছে এবং বৃষ্টি ছাটের ঘন কুয়াশায় চারদিক একাকার। সমস্ত গলিটা জলে ডুবে গিয়েছে, ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত জল থৈ থৈ করছে। সঙ্গে কারো একটা ছাতা বা ওয়াটারপ্রুফ কিছুই নেই, অথচ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একবারে স্নান করে যেত হবে।

ফিরে এসে সকলে আবার জাঁকিয়ে বসলাম।

মহীন বললে,—বেরুনোই যখন যাবে না তখন ভূতের গল্প শোনা যাক। সরোজ, বল একটা জমাটি ভূতের গল্প।

আমাদের মধ্যে বন্ধু সরোজই সাহিত্যিক। শুধু সে সাহিত্যিকই নয়, চমৎকার গল্প বলবারও তার একটা ক্ষমতা আছে। কিন্তু মহীনের

প্রস্তাবে বাধা দিয়ে দিব্যেন্দু বললে,—না, শচীনের নতুন কোন ম্যাজিক দেখা যাক।

আমি প্রস্তাবে এবার সায় দিলাম। হ্যাঁ, সেই ভাল। শচীন শুরু কর।

আমাদের দলের মধ্যে শচীন এ্যামেচার ম্যাজিসিয়ান না হলেও ম্যাজিকে সত্যিই তার বাহাদুরি ছিল। আশ্চর্যরকম ম্যাজিক এক এক সময় আমাদের দেখিয়ে সে কতদিন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে শচীন আপন মনে একটা সিগ্রেট টানছিল, আমার প্রস্তাবে সে বললে,ম্যাজিক যে দেখাবো তা জিনিস-পত্র কোথায় ?

ঠাট্টা করে সরোজ বললে, জিনিসপত্র না হলে ম্যাজিক দেখাতে পারবি না, তবে কিসের ছাই তোর ম্যাজিক !

—ঠিক আছে ! শুধু হাতেই দেখাবো !

সকলে আমরা উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

ঘরের আলোটা নিবিয়ে দে—শচীন বললে। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে একটা ক্যাণ্ডেল জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখ।

শচীনের কথামত তাই করা হলো। একটা মাত্র ক্যাণ্ডেলের আলো ঘরের মধ্যে অদ্ভুত আলোছায়া সৃষ্টি করেছে। আলোর শিখার একটা ছায়া সেই আধো-আলো, আধো-আঁধারে দেওয়ালের গায়ে কাঁপছে। বাইরে সমানে পড়ছে বৃষ্টি। শচীন তার পূর্বের আসনেই বসা। আমরা চারজন ঘরের একদিকে গা ঘেঁষাঘেষি করে বসেছি।

— কিরে, কই শুরু কর তোর ম্যাজিক—সরোজ বললে।

—চুপ কর। কথা বলিস না !—ভারি গলায় বললে শচীন।

তারপর সবাই চুপচাপ। এক মিনিট, দু মিনিট করে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছি।

এমন সময় সরোজ আবার প্রশ্ন করলে,—কি রে, শচে, ঘুমালি নাকি বাবা ?

—চুপ—দরজাটা খুলে দে, কে এসেছে দেখ—শচীন বললে।

সত্যিই! জলের ছপ্‌ছপ্‌ একটা শব্দ সকলেই আমরা শুনতে পেলাম। শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এসে বন্ধ দরজার কাছেই থামলো। তারপর দরজার গায়ে শব্দ উঠলো—টুক্‌ টুক্‌।

—কে!

আবার শব্দ টুক্‌ টুক্‌। আমিই উঠে গিয়ে দরজাটা খুললাম! সঙ্গে সঙ্গে একবার বিদ্যুৎ চমকালো। সেই ক্ষণিক আলোর দীপ্তিতে দেখলাম কে যেন একজন ঠিক দোর গোড়াতেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অস্পষ্ট একটা ছায়ার মত।

—কে?

কিন্তু আগন্তুক আমার প্রশ্নের কোন সাড়া দিল না, খানিকটা জমাট কুয়াশার মতই যেন পাশ কাটিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকতেই আমি দরজাটা যেমন বন্ধ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়ায় ঘরের একটি মাত্র ক্যাণ্ডেলের আলোটি নির্বাপিত হলো। মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারিদিক গ্রাস করলো। এবারে শচীন প্রশ্ন করলো—তুমি কে?

—আমি বিভূতি।— চাপা দীর্ঘশ্বাসের মত স্বাভাবিক গলায় সাড়া এলো।

—বিভূতি। কে বিভূতি?

—বিভূতি চক্রবর্ত্তী।

হাত বাড়িয়ে দরজাটার ঠিক কাছেই দেয়ালে আলোর সুইচ্‌টা টিপলাম। খট করে একটা শব্দ হলো মাত্র, কিন্তু ঘরের আলো জ্বললো না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হলো, কে যেন ঠিক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। নিজের অজ্ঞাতেই দু-পা পিছিয়ে একবারে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। ভয়ে তখন আমার গলা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠেছে। হঠাৎ এমন সময় মনে পড়লো বিভূতি, বিভূতি চক্রবর্ত্তী আমাদের বন্ধু। তবে—। সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয়টা কেটে গেল।

সোৎসাহে বললাম,—বিভূতি—তুই?—



—হ্যাঁ। সেই পূর্বের মত চাপা কণ্ঠস্বর। মনে হলো বড় যেন কষ্ট হচ্ছে তার কথা বলতে! আরো মনে পড়লো বিভূতি তো থাকে সেই ভবানীপুরে। প্রায় দশ-বার দিন আড্ডায় আমাদের আসে না সে। সেই প্রচণ্ড বর্ষণমুখর রাতে সেই ভবানীপুর থেকে ও এসেছে।

একটু বিস্ময়ই লাগে। আমি এবারে প্রশ্ন করলাম,—এই ঝড়-জলের মধ্যে এই রাত্রে তুই—ব্যাপার কি বিভূতি?

বিভূতি আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শচীনকে সম্বোধন করে বললে—শচীন আমাকে তুই ডাকছিলি কেন?

প্রশ্ন করলো এবার সরোজ,—এই জলের মধ্যে তুই এলি কি করে রে বিভূ?

—জল!

—হাঁ বাইরে ত ভীষণ বৃষ্টি।

—তা হবে!

—তা হবে কি রে—চারদিকে জল থৈ-থৈ করছে না? আগেই বুঝি বের হয়েছিলি?—বললে সরোজ।

—না ত! শচীন ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ত এলাম।

—ভিজে গেছিস ত একেবারে।

—না!

বলে কি বিভূতি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি!

হঠাৎ আবার বিভূতি বললে,—আমি যাই ভাই!

—যাবি! কোথায় যাবি এই বৃষ্টির মধ্যে! মাথা খারাপ হলো নাকি তোর!

—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে রে, আমি আর ঘরের মধ্যে থাকতে পারছি না। আমি চললাম। বলবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা যেন খুলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের আলোটা দপ করে জ্বলে উঠলো।

কিন্তু কোথায় বিভূতি! আমরা ঘরের মধ্যে হতভম্বের মত।

—বিভূতি। বিভূতি। আমি ছুটে দরজার বাইরে গেলাম।

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে! গলির মধ্যে জল অনেকটা কমে এসেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কাউকে দেখতে পেলাম না! কেবল একটা জলের মধ্যে দিয়ে কারো হেঁটে যাবার ছপ্ ছপ্ শব্দ কানে ভেসে এলো।

পরের দিন দুটো সংবাদ আমরা জানতে পারলাম। একটি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গত রাত্রে প্রচণ্ড তিন ঘণ্টাব্যাপী বৃষ্টির মধ্যে শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ মিনিট কুড়ির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, রাত্রি নয়টা পঁয়তাল্লিশ থেকে দশটা পাঁচ পর্যন্ত।

আর গত রাত্রে দিনকয়েক ভোগবার পর টাইফয়েডে আমাদের বন্ধু বিভূতি চক্রবর্তী রাত সাড়ে নয়টায় মারা গিয়েছে।

তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা আজও স্পষ্ট হয়ে আছে। তবে স্বীকার করতে পারিনি যেমন ব্যাপারটার মধ্যে শচীনের কোন ম্যাজিকের কেরামতি আছে, তেমনি এও স্বীকার করে নিতে মন চায়নি যে, ব্যাপারটার মধ্যে কোন কিছু ভৌতিক ব্যাপার আছে। তবে যা ঘটেছিল তা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

সব ভুতুড়ে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়



এক কোলিয়ারি থেকে আর এক কোলিয়ারিতে বদলি হয়ে এসেছি।

কয়লা-কুঠির ডাক্তার ভারি ঝকমারি কাজ। খাদের কুলি-কামিন থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজার সাহেব পর্যন্ত যে যেখানে আছে, সকলেরই জীবন মরণ যেন আমারই হাতে। আমি যেন তাদের বিধাতা। কারও পায়ে একটুখানি আঁচড় লেগেছে, ডাক্ ডাক্তারকে। কোথাও কোনও কুলিধাওড়ায় হয়ত রুগী মরেছে, ডাক্ ডাক্তারকে। খাদের নিচে কুলি মরেছে, সকলের আগে আমাকেই সেখানে ছুটতে হবে। সে যাই হোক, চাকরি করতে এসে সে দুঃখ করে লাভ নেই।

বাসাটি মন্দ নয়। টালি দেওয়া খানচারেক ঘর, সুমুখে দাওয়া উঁচু ছোট একটুখানি রক, রকের নীচেই উঠোন, উঠোনে রান্নার জায়গা।

চারদিক ফাঁকা। ভাবলাম, ভালই হ'লো। আগে যে কোলিয়ারিতে ছিলাম, প্রকাণ্ড কোলিয়ারি, ছোটখাট একটা শহর বললেই হয়। চারদিকে ধোঁয়া আর বস্তি, দম যেন আটকে আসত। এখানে তা হলেও একটুখানি নিশ্বাস নিয়ে বাঁচব।

ম্যানেজারবাবু বাঙালী। বড় অমায়িক ভদ্রলোক! প্রথম এসেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়টা জমিয়ে রাখা ভাল। বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে সেদিন তাঁর বাংলোর দিকেই যাচ্ছিলাম। কালো রঙের

ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে এক ভদ্রলোক আমায় দেখে নমস্কার করে পথের মাঝে থমকে দাঁড়ালেন। গোঁফগুলি নিচের দিকে বেঁকে আছে। মুখের পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই নতুন ডাক্তার, না? আমি হেড ক্লার্ক।

কী আর বলব, ঘাড় নেড়ে একটুখানি হেসে নমস্কার করে এগিয়ে যাচ্ছি, তিনি আমার পিছু নিলেন। বললেন, 'চলুন তবে ওইদিক দিয়ে যাই, আপনার সঙ্গে গল্প করাও হবে।

বলেই তিনি নিজের পরিচয় দিতে শুরু করলেন। এখানে চাকরি করেছেন প্রায় দশ বছর, অথচ একটি দিনের জন্যেও তিনি কামাই করেন নি। বাড়ি তাঁর বেশি দূরে নয়। এখান থেকে প্রায় মাইল খানেকের মধ্যেই একটা গ্রামে। সন্ধ্যার আগেই রোজ তাঁকে বাড়ি পৌঁছতে হয়।

কোনও কথাই তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করিনি, তবু তিনি আমায় সাবধান করে দিলেন। বললেন, 'দেখুন, এখানকার নিয়মই হচ্ছে তাই। আপনিও যেন সন্ধ্যের পর আর বাসা থেকে বেরোবেন না। নতুন মানুষ, জানেন না তো, তাই সাবধান করে দিলাম।'

বললাম, 'কেন?'

বলতেই তাঁর সেই কালো গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে পানে-রাঙা লাল লাল কয়েকটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। বুঝলাম, তিনি একটুখানি হাসলেন।

বললেন, 'জিজ্ঞেস করবার কিছুই নেই, বড় ভীষণ জায়গা মশাই। আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

বললাম 'না।'

'এই মরেছেন! চারিদিকে ভূত মশাই, কোলিয়ারিটা ভূতে ভূতে একেবারে ছেয়ে গেছে। সন্ধ্যে হলে এ তল্লাটে আর জন-মনিষ্যি দেখতে পাবেন না। খাদের নীচে দিনের বেলাতেই লোকজন নামতে ভয় করে, রাত্রের কাজ তো একরকম উঠেই গেছে! অন্ধকার রাত্রে

একদিন দেখবেন কি ভীষণ ব্যাপার! ঘরে বসেই হয়ত শুনতে পাবেন, ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে, খাদ চলছে, ঘণ্টা বাজছে, ট্রাম লাইনের উপর ঘড়্ ঘড়্ করে কয়লার গাড়ি ঠেলার শব্দ পাচ্ছেন, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখুন—সব চুপ। কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যায় হয়ত দেখলেন, ডিপোয় কয়লার একটি গুঁড়ো পর্যন্ত নেই। সকালে গিয়ে দেখুন, চার-পাঁচ ওয়াগান কয়লা গাদা হয়ে গেছে।'

বললাম, 'তা হলে তো ভালই বলতে হবে। ভূতগুলো খুব উপকারী বলুন!'

ভদ্রলোক আবার তেমনি দাঁত বের করে একবার হাসলেন ঃ বললেন, 'তা বললে হবে কি, খুন-জখম যে লেগেই আছে। এমন মাস গেল না যে খাদের নিচে দু'চারটে খুন না হচ্ছে। আগে মশাই, যা কিছু হ'তো— ওই খাদের নীচেই হ'তো, গত দু-বছর ধরে ভূতগুলো দেখছি উপরে উঠে এসেছে। এই ধরুন, আমার আপিসের খাতাপত্র। আজ ঠিক যেমনটি রেখে চাবি বন্ধ করে দিয়ে এলাম, কাল এসে দেখব —সব ওলট-পালট হয়ে গেছে, এখানকার জিনিস ওখানে, ওখানকার জিনিস এখানে, একেবারে তচনচ কাণ্ডকারখানা! তবে, নষ্ট কিছু করে না—এই যা। আজকাল গা-সওয়া হয়ে গেছে।'

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাই বুঝি বেলা থাকতে থাকতে আপনাকে বাড়ী পৌঁছতে হয়?'

ঘাড় নেড়ে ভদ্রলোক জানালেন, 'নিশ্চয়, একদিন যে কাণ্ড ঘটেছিল মশাই, শুনলে আপনার গা-হাত-পা শিউরে উঠবে। থাক, আজ আর দেরী হয়ে যাচ্ছে, আর একদিন বলব। এখন চলি। নমস্কার।' বলেই তিনি তাঁর হাত দুটি তুলে আমায় আর একটি নমস্কার করে ডানদিকে রাস্তা ভাঙলেন।

ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে সেদিন আমার অনেক কথাই হলো। বললাম 'ভূতের কথা কি সব শুনছি, আপনার কোলিয়ারিতে—একি সত্যি?'

ম্যানেজারবাবু হাসলেন। বললেন, 'শুনেছেন এরই মধ্যে?'

বললাম, 'শুনেছি, কিন্তু ভূত আবার কি? আমার তো বিশ্বাস হয় না কোনদিন।'

ঘাড় নেড়ে ম্যানেজারবাবু বললেন, 'কিছু নয়। তবে খাদের অবস্থা বড় খারাপ। চালগুলো অত্যন্ত নরম। খুব সাবধানে কাজ করতে হয়, নইলে কয়লা কাটতে গিয়ে চাল থেকে পাথর খসে পড়ে, লোকজন প্রায়ই মারা যায়।'

কিছুদিন আগে—না, কিছুদিন আগে কেন, অনেকদিন আগে, আমি তখন এখানে ছিলাম না। সিপারন নদীতে সে-বছর ভয়ানক বান হয়। বানের জল এত বেশি বেড়ে ওঠে যে, হঠাৎ একদিন দেখতে-না-দেখতে বান এসে পড়ে খাদের মুখে। 'চানকের' পথে হুড়্ হুড়্ ক'রে জল ঢুকতে থাকে। তাকে আর রোখে কে? দিনের বেলা। খাদের নীচে তখন কাজ চলছে। লোকগুলোকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু দুদিন ধরে ক্রমাগত জল ঢুকেছে। তিন দিনের দিন বান যখন কমল, খাদ তখন ভর্তি হয়ে গেছে। পাম্প দিয়ে জল তুলে তুলে অনেক কষ্টে নিচে নেমে গিয়ে দেখা গেল, প্রায় পঞ্চাশজন লোক খাদের খোলে মরে পড়ে রয়েছে। ব্যস, সেই থেকে লোকের ধারণা হ'লো যে, অতগুলি লোক একসঙ্গে যেখানে মারা যেতে পারে, ভূত সেখানে আছেই। এই বলে তিনি খুব জোরে হেসে উঠলেন।

আমিও হাসলাম বটে, কিন্তু কেবলই আমার মনে হতে লাগল —আহা, অতগুলো মানুষ কোনদিক থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে নিতান্ত অসহায়ের মত হাহাকার করে জলে ডুবে মারা গেল। কারও হয়ত বুড়ো বাপ-মা আছে খাদের উপরে কুলিধাওড়ায়, কারও ছেলে, কারও মেয়ে, কারও স্ত্রী, কারও উপরে কুলিধাওড়ায়, আরও ছেলে, গিয়ে মুখের হাসি আমার মুখেই মিলিয়ে গেল,—সে করুণ দৃশ্য যেন আমি আমার চোখের সুমুখে দেখতে পেলাম।

গল্প করতে করতে সন্ধ্যে হ'লো। ম্যানেজারবাবুর চাকর আমাদের

কাছে লণ্ঠন দিয়ে গেল। উঠতে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'একটু চা খেয়ে যান!'

চা খেয়ে তাঁর কাছ থেকে যখন বিদায় নিলাম, রাত্রি তখন আটটা।

ম্যানেজারবাবু বললেন,'আলো নিয়ে চাকরটা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

ভাবলাম, তিনি ভেবেছেন হয়ত ভূতের ভয়ে রাস্তায় যদি আমার আবার কিছু বিপদ-আপদ হয়। হেসে বললাম, 'না, কিছু দরকার নেই। ভূতের ভয় আমি করি না।'

তিনিও হেসে আমায় নমস্কার করে দরজাটি বন্ধ করে দিলেন।

ফটক পেরিয়ে বাইরে যখন পথে এসে দাঁড়ালাম, দেখি অন্ধকারে তখন চারিদিক থম্‌-থম্‌ করছে, কোথাও জনমানবের সারা-শব্দ নেই। মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশটা যেন তারায় ঠাসা। তারই একটুখানি ঝাপসা আলোয় পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চললাম।

বাসাটা আমার নেহাত কাছে নয়। পথের পাশে দু'তিনটে কুলিধাওড়া পেরিয়ে গিয়ে আম-কাঁঠালের একটি বাগান, তার পরেও খানিকটা কালো কয়লার গুঁড়ো দিয়ে তৈরী ছোট একটি পথ, তারই কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বাহাতি একটা পোড়ো বাড়ির মত ভাঙা বাড়ি সেইখান থেকে ডানদিকে একটা নিম গাছের তলা দিয়ে মিনিট-দুই হাঁটলেই আমার বাসার দরজায় গিয়ে পৌঁছব।

কি যেন ভাবতে ভাবতে আমি সেই বাগানের ভিতর সরু একফালি পায়ে-চলা পথের উপর দিয়ে চলেছি। মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে আমার পিছনের কুলিধাওড়ার সেই যে একটা কুকুর চেঁচাতে আরম্ভ করেছে, তার চিৎকার তখনও থামেনি। হঠাৎ দেখি কয়েকটা গাছের তলা দিয়ে শুকনো পাতার উপর ঘড়্‌মড়্‌ শব্দ করতে করতে মস্ত লম্বা কালো রঙের একটা লোক আমার সুমুখে এসে

দাঁড়ালো। আচম্‌কা অন্ধকারে সত্যিই আমি একটুখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, তার আগেই লোকটা আমার আরও একটুখানি কাছে সরে এসে বললে, 'ডাক্তারবাবু, তুই একবার আয় আমার সঙ্গে।'

লোকটা বোধহয় সাঁওতাল। বললাম, 'কেন?'

সে বললে, 'ছেলেটাকে আমার বাঁচাতে হবেক্ ডাক্তার। তুই যদি না যাবি তো ছেলেটা মরে যাবেক্—তুই আয়।'

'কি হয়েছে তোর ছেলের?'

বললে, 'তা জানি না বাবু, তুই দেখবি চল্, আবার তুকে আমি ঘরের কাছে দাঁড়াই দিয়ে যাব।' গলার আওয়াজ শুনে মনে হ'লো লোকটা এক্ষুণি হয়ত কেঁদে ফেলবে। আমি আর 'না' বলতে পারলাম না। বললাম, 'চল্।'

বাগান পেরিয়ে আমরা আর একটা রাস্তা ধরলাম। সে আমার আগে আগে চলতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোর নাম কি?'

বললে, 'আমার নাম টুইলা হাঝি।'

বললাম, 'কতদূর যেতে হবে?'

হাত বাড়িয়ে কাছেই কয়েকটা খোড়ো ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ওইখানে।' চুপ করে আর কত চলি, তার সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলাম। 'খাদে বুঝি তুই কয়লা কাটিস?'

'হুঁ বাবু!'

'কটি ছেলে তোর?'

'ওই একটি।'

'ছেলেটি কত বড়?'

'তা অনেক বড় বটে।'

'তবু—ক'বছরের?'

'কে জানি তা! অত সব জানি না।'

এমনি সব নানান কথা কইতে কইতে পথ আমরা চলেছি তো

চলেছিই। সামনে হাত বাড়িয়ে যে ঘরগুলি সে আমায় দেখিয়েছিল যতই এগিয়ে যাই, মনে হয় সেগুলো আরও দূরে। বললাম, 'একি রে টুইলা, কাছে বলেছিলি যে।' টুইলা বলল 'হুঁ বাবু, কাছে নয় তো কি ?' কিন্তু পথ যেন আর ফুরোয় না! 'ছেলেটার তোর কি হয়েছিল প্রথমে ?'

টুইলা চুপ করে রইল।

'প্রথমে হয়েছিল কি ? হাঁরে !'

টুইলা যেন বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে। বললে, 'খাদে বানে ঢুকেছিল।'

'বান !' হঠাৎ আমার ম্যানেজারবাবুর সেই বানের কথাটা মনে পড়ল। বললাম, 'কখন রে ? সে তো অনেকদিন—'

টুইলা বললে, 'হুঁ অনেক দিন।'

বললাম, 'তারপর।'

তারপর—আমরা তেমন অনেক লোক ছিলাম খাদের ভিতরে কয়লা কাটছিলাম।'

বললাম, 'সেখান থেকে কেউ তো বাঁচেনি শুনলাম, তুই বাঁচলি কেমন করে ? টুইলা জবাব দেয় না।

এবার আমার কেমন যেন মনে হ'লো। বললাম, 'হাঁরে টুইলা। শুনছি নাকি এখানে খুব ভূতের ভয়! সত্যি নাকি ?'

হঠাৎ দেখি, টুইলা নেই। অন্ধকারে, ভাবলাম, কালো মানুষ হয়ত খানিকটা এগিয়ে গেছে তাই দেখতে পাচ্ছি না। ডাকলাম, 'টুইলা!'

কোথায় টুইলা। এদিক-ওদিকে আগে-পাছে তাকিয়ে দেখি, টুইলা কোথাও নেই। চারিদিকে দিকচিহ্নহীন অন্ধকার। আর ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক। মাথার ভিতরটা চন্‌চন্ করে উঠল। সমস্ত শরীরেও রক্ত তখন আমার জল হয়ে গেছে।

পিছন ফিরে ছুটবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ছুটে আমি যাব কোথায় ? চিৎকার করলেই বা কে শুনবে।—ভাবলাম, মৃত্যু

অনিবার্য। চলতে গিয়ে দেখি, পা-তুটো আড়া, গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কোন্ দিক দিয়ে কেমন করে কতক্ষণ যে চলছি কিছুই আমার মনে নেই। অন্ধকার কেটে গিয়ে চারিদিকে যখন ফর্সা হচ্ছে, দেখি তখনও আমি পথ চলছি। শরীরে তখন আমার শক্তি নেই, পায়ে জোর নেই, নিতান্ত কেমন যেন মরিনি বলেই বেঁচে আছি—এমনই আমার মনে হতে লাগল। দূরে কতকগুলো লোক আসছে দেখে সেইখানে সেই পথের ধারেই আমি বসে পড়লাম। কিন্তু কাউকে যে আর বিশ্বাস হয় না। এরাও ভূত নয় তো ?

প্রভাতের আলোয় দেখলাম, কয়েকজন কুলি তাদের ঝোড়া গাঁইতি কাঁধে নিয়ে কুঠিতে বোধহয় কাজ করতে চলেছে! জিজ্ঞাসা করলাম, হাঁরে, ডোম্‌রানা কোন্ দিকে ?'

একজন বললে, 'সে হেথা কোথা বাবু ? উই যে চিমনি দেখছিস হোইখানে!'

সর্বনাশ! উঠে দাঁড়ালাম। প্রায় তিন মাইল হেঁটে একেবারে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আধ মরা হয়ে বাসায় যখন ফিরলাম, দেখি বাড়িতে তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে। মেয়ে, ছেলে, এমনকি চাকরটা পর্যন্ত সারারাত্রি ঘুমোয়নি। অপরিচিত জায়গা ভগবানের উপর নির্ভর করে সবাই তখন হাঁ করে পথের পানে চেয়ে আছে।

পাছে ওরা ভয় পায় ভেবে কাউকেই কিছু বলিনি। বললাম, 'মরণাপন্ন একটি রুগীর কাছে সারারাত আমায় জাগতে হয়েছে।'—বলেই সেখান থেকে আমার বদলি করবার জন্য কোম্পানির হেড-অপিসে দরখাস্ত করে জবাবের আশায় বসে আছি, এমন দিনে আবার আর এক তুর্ঘটনা। রাত্রি প্রায় একটা। ম্যানেজারের কাছ থেকে ডাক এল খাদের নিচে লোক মরেছে, আমায় যেতে হবে।

বলে পাঠালাম, 'যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ম্যানেজারবাবুকে দয়া করে এখানে একবার আসতে বল। আলো হাতে তু'জন চাপরাশী

সঙ্গে নিয়ে ম্যানেজারবাবু নিজেই এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, ভূতের ভয় বুঝি? সেদিনের সেই টুইলার কথাটা আমি তাঁকে বলিনি। লজ্জায় বলতে পারিনি।

বললাম, 'না, তা নয়! খাদের নীচে রাত্রে তো এখানে কাজ কেউ করে না, তবে মরল কেমন করে?'

ম্যানেজার বললেন, 'কিছু কয়লার দরকার ছিল তাই ডবল হাজরি দিয়ে মদ খাইয়ে নামিয়েছিলাম। পুলিশে খবর পাঠিয়েছি, তার আগে চলুন একবার দেখে আসতে হবে।'

অনেকগুলো লোকজন সঙ্গে নিয়েও ভয়ে ভয়ে খাদে গিয়ে নামলাম। কিন্তু অবাক কাণ্ড। কিন্তু কয়লা কাটা হচ্ছিল। সাত নম্বর কাঁথির মুখে। সেইখানেই কয়লার চাবড়া মাথায় পড়ে লোকটা মরেছে। মরবার পর মৃতদেহ তার সেইখানেই ফেলে রেখে লোকজন উপরে উঠে এসেছিল! ফিরে এসে দেখা গেল, মৃতদেহ সেখানে নেই। মাল-কাটারা সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে প্রচুর আলো এবং লোকজনের সঙ্গে আমরা মৃতদেহের সন্ধান করতে লাগলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল, তার সেই রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা 'গেফের মাঝখানে—সেখানে যাবার কোন সম্ভাবনাই তার নেই। মৃতদেহটাকে সেখান থেকে টেনে এনে আবার সেই সাত নম্বর কাঁথির কাছে রেখে দিয়ে আমরা তো উপরে উঠে এলাম। পুলিশ না আসা পর্যন্ত মৃতদেহ উপরে তোলবার উপায় নেই! অথচ প্রচুর পুরস্কারের লোভেও কেউ সেখানে মড়া আগলে থাকতে রাজী হ'লো না।

রাত্রি তখন কত ঠিক মনে নেই। পুলিশ এসেছে। আবার আমরা খাদের নিচে নেমে গেলাম। এবার আমাদের সঙ্গে আর বেশি লোক গেল না। যেতে চাইল না। ম্যানেজারবাবু হেসে বললেন, 'পুলিশ যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে আর ভাবনা কি? ভূতেরও তো

পুলিশের ভয় আছে!'

ম্লান হাসি হেসে নেমে তো গেলাম। যা থাকে কপালে। একে রাত্রির অন্ধকার, তায় আবার কালো কয়লার সেই পাতালপুরী চারদিক কালো। তবে আমাদের সঙ্গেও আলোও ছিল প্রচুর। প্রত্যেকের হাতেই একটি করে সেফ্‌টি ল্যাম্প। পুলিশের ইন্স্‌পেক্টরের হাতে টর্চ। আগে আগে যাচ্ছে মালকাটার সর্দার। কিন্তু গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড!

মৃতদেহ সামনে নেই। খালি খানিকটা রক্তের দাগ কালো কয়লার উপর জমাট বেঁধে রয়েছে দেখলাম। ও-ওর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে দাঁড়িয়ে আছি। কারও মুখে কোনও কথা নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। খাদের চাল থেকে কোথাও বা খুট্‌-খুট্‌ করে ছোট ছোট কয়লার টুকরো খসে খসে পড়ছে, কোথাও বা টুপ টুপ করে জল পড়ার শব্দ পাচ্ছি। কি করা যায়?

ইন্স্‌পেক্টর বললেন, 'আসুন এদিক-ওদিক খোঁজ করে দেখি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

বিশ্বাস তাঁর না হবারই কথা। কিন্তু আমরা আর না বিশ্বাস করে যাই কোথায়! এর আগের বারেও তো এমনি হয়েছিল।

খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলাম। ইন্সপেক্টরবাবু বেশী সাহসী লোক। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে তিনি সবার আগে চললেন। সবার পেছনে যেতে আমার ভয় করছিল। কাউকে জানতে না দিয়ে ফস্‌ করে আমি এক সময় মাঝে গিয়ে ঢুকলাম।

খোঁজার আর অন্ত রইল না। কিন্তু লাশ আর পাওয়া যায় না। খুব ছোট একটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলেছি, হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার। ভয়ানক একটা কিছু অপঘাত ঘটলে মরবার আগে মানুষ যেমন করে চেঁচিয়ে উঠে—এও যেন ঠিক তেমনি একটা গোঙানির শব্দ! একেবারে ইন্সপেক্টরবাবুর পায়ের কাছে। আমরা তো সব চমকে উঠে শিউরে খানিকটা পিছু হটতে গিয়ে এ-ওর গায়ে লাগলাম

ধাক্কা। ভয়ে তো আমি ম্যানেজারবাবুকে তখন জড়িয়ে ধরেছি সর্বাঙ্গ শির্‌শির্‌ করে পায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে। গেলাম আর কি! বাঁচবার আর কোন আশা নেই।

ইন্সপেক্টরবাবু তো অত সাহসী লোক। টর্চের আলো ফেলে যেমনি নিচের দিকে তাকিয়েছেন—দেখেন, মৃতদেহের বুকের উপর পা দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে!

'বাপ্‌!' বলে তিনি লাফিয়ে একেবারে উল্‌টে এসে পড়লেন আমার ঘাড়ে। আমি পড়লাম ম্যানেজারের গায়ে, ম্যানেজার দিলেন একটা কনস্টেবলের পা মাড়িয়ে। এমনি করে সবাই মিলে আমরা হুটোপুটি করছি, এমন সময়—অবাক কাণ্ড! ইন্সপেক্টরের হাতের টর্চ গেল নিবে, অনেক টেপাটেপি করেও কিছুতেই আর জ্বালানো গেল না। তারপরে একে-একে আমাদের প্রত্যেকের হাতের আলোগুলো নিবতে আরম্ভ করল।

প্রাণের আশা তখন একেবারেই ছেড়ে দিলাম।

কাঠ হয়ে আমারা দাঁড়িয়ে পরলাম—'যেমন করে হোক, দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে সুড়ঙ্গের দেওয়াল ধরে চলুন আমরা ফিরে যাই। এমন করে এখানে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভাল।'

সর্দার বললে, 'চল আমি পথ চিনি। দে' একটো জ্বালা কাঠির বাস্‌কো দে আমার হাতে।'

ফিস্‌ ফস্‌ করে সর্দার যেই একটা কাঠি জ্বেলেছে, তারই সেই সামান্য আলোতে দেখলাম কিম্ভুতকিমাকার প্রকাণ্ড একটা দৈত্যের মত কালো কুচ্‌কুচে এক সাঁওতাল এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সুমুখে। লম্বা লম্বা হাত-দুটো বাড়িয়ে সে আমাদের সুড়ঙ্গের পথ আগলে বলে উঠল—'যাবি কুথা? ছেলেকে আমার বাঁচা এগুতে, তা বাদে যাবি।'

ইন্সপেক্টরের পকেটে ছিল রিভলবার, চট করে সেটা বের করে তিনি ধাঁ করে চালালেন এক গুলি। ভীষণ আওয়াজে কানে আমাদের তালা লেগে গেল।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ শুনতে পেলাম, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ইন্সপেক্টর চিৎকার করে উঠলেন – 'গেলাম ! গেলাম ! ওরে বাবারে ! ছেড়ে দে বাবা ছেড়ে দে !'

ভূতে মানুষে মারামারি ! ইন্সপেক্টরের গোঙানির আঁওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন তাঁকে আমাদের কাছে খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। ঝটপট্ করতে করতে সব থেমে গেল। শুনলাম সাঁওতালটা বলছে, গুলি চালাবি আর ! চালা দেখি কেমন মরদ ! আমরা তখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি। আমাকে মেরেছিস বানে ডুবোই, জলের ভেতর ঠিক ইঁদুর মারা করে। ছেলেটা ছিল, আবার তাকেও মেরে দিলি !' বলতে বলতে সাঁওতালটা এগিয়ে এল আমাদের দিকে। কই তোদের ম্যানেজার কই ?'

ম্যানেজারবাবু কেঁদে ফেললেন, 'দোহাই বাবা, আমায় ছেরে দে বাবা, আমার কোনও দোষ নেই !'

'আচ্ছা তুথে না হয় ছেড়ে দিলাম, কই ডাক্তারটো কই ;' বলেই হাত বাড়িয়ে টপ করে আমার ঘাড় ধরে বললে, 'আয় দেখ্ যদি তুই বাঁচাতে পারিস !'

আমার তখন দম আটকে এসেছে। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। গোঁ গোঁ করছি। তারপর কেমন করে যে উপরে উঠে এসেছি কেমন করে যে বাড়ি পৌঁছেছি, কিছুই জানিনে।

চাকরি ছেড়ে দেব বলে দরখাস্ত তো আগেই করেছি, জবার এল কি-না জানবার জন্যে বেলাবেলি তো গেলাম সেদিন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে।

গিয়ে শুনি, অদ্ভুর ব্যাপার। কাল রাত্রি থেকে ম্যানেজারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খাদের নিচেও না, খাদের উপরেও না।

সর্বনাশ ! সর্বাঙ্গ আমার শিউরে উঠল।

তাহলে তিনি গেলেন কোথায় ?

সমাপ্ত